সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা
সমুদ্রকন্যা

সমুদ্রকন্যা

শৈলেশ দে

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীবংশীধর সিংহ
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রণে ঃ
বাণীমুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমার সঙ্গীত জীবনের পথপ্রদর্শক

শ্রীযুক্ত শম্ভু পাল

করকমলেষু—

এই—শুনছো !

জানালাটা একটু খুলে দাওনা !

ঠাণ্ডা আসবে !

আসুক না ! ভারী গুমোট । দাও একটু খুলে !

আকাশের ঐ তারাগুলো দেখেছ ! ভারী সুন্দর, তাই না ?

ঠিক যেন মনীষার চোখ দুটোর মত ।

জানো মল্লিকা, আকাশের বুকে ফুটে থাকা ঐ তারাগুলোর পানে তাকালেই আমার মনীষার কথা মনে পড়ে যায় ।

ঠিক এমন জ্বল জ্বল করতো ওর চোখ দুটো ।

এমনি উজ্জ্বল । এমনিই শান্ত, স্নিগ্ধ ও সমাহিত ।

আজ তোমাকে মনীষার কথা শোনাবো মল্লিকা ।

মনীষার সব কথা হয়তো তুমি ঠিক সমর্থন করতে পারবে না । সংস্কার বা রুচিতেও হয়তো বাধবে ।

তবু বিশ্বাস করো—এ শুধু মনীষারই কথা । এক্ষেত্রে আমি একজন নিরপেক্ষ শ্রোতা মাত্র ।

সতীত্ব কি দেহাশ্রয়ী ? দেহটাই কি সব ?

সেদিন মনীষার এই অনন্ত জিজ্ঞাসার আমি কোন জবাব দিতে পারিনি মল্লিকা । আজও কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি । প্রশ্নটা তেমনি প্রশ্নই রয়ে গেছে ।

মনীষাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম পুরীর নির্জন সমুদ্র-সৈকতে । সমুদ্রের অকূলের দিকে তার চোখ ছিল স্থির নিবদ্ধ । যেন দিগন্তের ওপারের কোন এক অজানা রহস্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল সে ।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে । জীবনের পান্থশালায়

কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। তবু তারই মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকে যারা লক্ষ মানুষের ভিড়েও হারিয়ে যায় না। এই মেয়েটিও যেন তাই।

কতই বা বয়েস। বছর ত্রিশেক হবে হয়তো।

সাধারণ মেয়ে। সচরাচর যেমন দেখা যায়। পরনেও অতি সাধারণ একটি মিলের শাড়ি। কোন প্রসাধন নেই। কোন পারিপাট্য নেই। সাধারণ—তবু যেন অপরূপা।

সামনেই সমুদ্র। পায়ের কাছে নাগিনীর মতই ফণা তুলে ধেয়ে এসে ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ভাঙাগড়ার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙাগড়া মিছিলের।

আশ্চর্য, মেয়েটি তেমনি নিশ্চল। সেই একইভাবে সে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুদূরের ঐ আকাশ সমুদ্রের মিলন-রেখার পানে।

এলোমেলো বাতাসে উড়ছে শাড়ির আঁচল। তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সমুদ্র যেন এক বিচিত্র রূপে ধরা দিয়েছে ওর চোখের সামনে।

সহসা বাতাস দিক বদলায়। শুরু হয় ঠাণ্ডা হাওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাউয়ের বনে সেকি করুণ কান্না! মনে হল, কোথায় যেন একটা চাপা ক্রন্দনধ্বনি গুমরে গুমরে ফেরে এলোমেলো হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে।

ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালাম। গতিক সুবিধের নয়। সমুদ্র আজ সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয়, বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল অথৈ অনন্ত পারাবার সমুদ্রের সে কি বিচিত্র রূপ! সে কি তার নাচের ঘটা! বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহু সে আঘাত

করতে লাগল তটবেষ্টনীর উপর। আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে উঠেছে তার মত্ত গর্জন। মনে হয়, পৃথিবীর বুকের অতল থেকে ভেসে আসা আদিম আর দুর্বোধ্য ভয়ঙ্কর একটা বিলাপ যেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মেয়েটি ফিরে তাকালো। মুহূর্তে দুজনের দৃষ্টি হারিয়ে গেল পরস্পরের মধ্যে।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। কিন্তু মনে হল যুগ যুগ বুঝি এমনি করেই কেটে গেল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সহসা চমকে উঠলাম। সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া কি আশ্চর্য আর্ত মুখ মেয়েটির। কালো দীঘির মত চোখ দুটোতে কি অপরিসীম বেদনার ছায়া। মনে হয়, কোন বুকভাঙা বেদনার প্রতিমূর্তি যেন।

সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল। আচম্বিতে মরুভূমির বুকে ঝড় উঠল যেন। বালি আর বালি। অজস্র বালিকণা।

চোখে চশমা ছিল বলে খানিকটা বেঁচে গেলাম। কিন্তু বিপদ হল মেয়েটির। নাকে-কানে চোখে-মুখে বালি ঢুকে সে তখন দিশেহারা। দৃষ্টি অন্ধ। চোখ খোলবার উপায় নেই। তদুপরি উদ্দাম বাতাসের ঝাপটা। বিশ্রী একটা বিপদ ঘটে যাওয়াও যেন বিচিত্র নয়।

এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—নিন, ধরুন। সামনেই আমাদের হোটেল। চলুন ওখানে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ঝড় থামলে পরে যাবেন।

আকাশ বাতাস ক্ষেপে উঠেছে। এই তাণ্ডবের মধ্যে পথ চলাই দায়। বাতাসের যা দাপট, মনে হল বুঝি উড়িয়েই নিয়ে যাবে। তবুও এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বে-ভিউ হোটেলে। সঙ্গে সঙ্গেই নামল বৃষ্টি। প্রথমে ফোঁটায়। তারপর মুষলধারে।

সামনেই আমার কামরা। মেয়েটিকে বসতে বলে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলাম স্নানের ঘরে। সারা গায়ে বালি বোঝাই হয়ে রয়েছে। স্নান করা দরকার।

মল্লিকা, উন্মুক্ত ফেনিল সমুদ্র আমাকে অভিসারে ডেকেছে বার বার। কোন বারই পারিনি তার সেই মৌন আহ্বানকে উপেক্ষা করতে।

এমনি বহুবারই এসেছি। বরাবরই এসে আশ্রয় নিয়েছি শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত এই বে-ভিউ হোটেলে। সী-বীচ্-এর মত উচ্ছাসে আনন্দ-কৌতুকে হুটোপুটি করে এখানকার সমুদ্র-সৈকতকে কেউ সর্বক্ষণের জন্য মুখর করে রাখে না। চোখ বা রুচিকেও কেউ পীড়া দেয় না।

এখানে বর্ণের সমারোহ নেই, দীপ্তি নেই, দাহ নেই। আছে স্নিগ্ধতা, নির্জনতা, প্রসন্নতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নানের ঘর থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু একি। মেয়েটি কোথায়!

বাইরে ঝড়ো হাওয়া সেই একইভাবে শব্দের একটানা ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে।

হাওয়ার করুণ কাতরানি আর বৃষ্টিধারার অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

নেই সেই মেয়েটিও। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই সে কখন চলে গেছে।

ম্যানেজার মুকুন্দবাবু পুরোনো লোক। ব্যাপারটা অনুমান করে তিনি বললেন—মনীষা দেবীকে খুঁজছেন নাকি?

—মনীষা দেবী! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কার কথা বলছেন?

—একটু আগে যাঁর সঙ্গে এলেন, ওঁর কথাই বলছি। তা উনি তো এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

—বেরিয়ে গেলেন! এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।

—ঝড়বৃষ্টি ওঁর কি করবে। ওঁর স্বভাবই ঐরকম।

—তার মানে! অবাক হয়ে বললাম—চেনেন নাকি?

—চিনবো না কেন! আমাদের হোটেলেই তো থাকেন।

—সে কি! কই, এর আগে তো কোনদিন দেখিনি।

দেখবেন কি করে? আমরাই কি খুব একটা দেখতে পাই। সারাদিন যে কোথায় থাকেন, কোথায় যান, তা তিনিই জানেন! খাবারটা প্রায়ই পড়ে থাকে। রাত্রে কখন যে ফিরে আসেন তাও বলা মুশকিল। বছরের ঠিক এই সময়টাতে একবার করে আসেন। দিন কয়েক থেকেই আবার চলে যান। যাকে বলে একেবারে খাপছাড়া মেয়ে।

সেই রাত্রে আমি বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি মল্লিকা। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মনীষার সেই সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া আর্ত মুখখানি।

নারী-মন চিরদিনই পরাশ্রয়কামী। সংসারের মধ্যেই তারা খুঁজে পায় শান্তি। পায় তৃপ্তি। পায় সার্থকতা। সেখানে একি বিচিত্র বেপরোয়া রূপ!

কেন ও সর্বক্ষণ এমনি করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়?

কিসের আকর্ষণে? কি চায় ও? কি খোঁজে?

বোধ হয়, সচেতন মনে বাসা বাঁধা কোন নিরন্ধ্র কামনাই এর উৎপত্তি স্থল।

তারপর একে একে তিনটি দিন কেটে গেল। কিন্তু কোথায় সেই কালো দীঘির মত ব্যথাভরা দুটি চোখ।

হোটেল ভর্তি লোক। রোজই আসছে আর যাচ্ছে। কিন্তু মনীষা কোথাও নেই। জানা গেল রোজই নাকি খুব ভোরে উঠে সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত্রে সবাই ঘুমোলে পরে। খাবারটা তার ঘরেই ঢাকা দিয়ে রাখা হয়। বেশির ভাগ দিনই খায় না। খাবারটা যেমন ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

ক্রমে ক্রমে মনীষার সব কথা ভুলেই গেলাম। ইতিমধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেছে। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবেই আবার একদিন মনীষার দেখা পেয়ে গেলাম

সেই সমুদ্র-সৈকতে। সেই একইভাবে। সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই সে তাকিয়ে আছে দূর দিগন্তের সীমারেখার পানে। মনে হয়, সমুদ্রের এই এলোমেলো হাওয়ায় তার স্মৃতির পাথারেও যেন কি একটা ঢেউ উঠেছে।

ঢেউয়ের শব্দে চতুর্দিক কম্পমান। মাথার উপরে ও নিচে দুটি নীল সমুদ্র। দিগন্তপ্রসারী সেই মহা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর মনীষা। কাছে-কিনারে আর কেউ নেই।

কতক্ষণ কেটে গেল হিসেব করিনি।

তারপর সহসা একসময়ে মনীষা ফিরে তাকালো। আশ্চর্য! সেই আর্তমুখ। সেই হতাশায় ভরা দৃষ্টি। মনে হল, ওর ঐ চোখ দুটির আড়ালে যেন একরাশ কান্না থমকে থেমে আছে। একটু নাড়া পেলেই তা ঝরে পড়বে।

—ভালো আছেন?

পরিচিত ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে মনীষা এগিয়ে এল। জবাব না দিয়ে একটু হাসলাম মাত্র। এসব প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। হাসিই এর একমাত্র জবাব।

—কদিন থাকবেন এখানে? মনীষার প্রশ্ন।

—ভাবছি কালই ফিরে যাবো। আপনি?

—আমি? কালো চোখের তারায় বিষণ্ণ একটা করুণ ছায়া ঘনিয়ে এল মনীষার। জানিনে। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারি। আবার দেরিও হতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সামনেই নীল সমুদ্র। আকাশের নীল ছায়া তার সঙ্গে মিশে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়। আবার সরে সরে যাচ্ছে। মনীষার দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ।

সহসা কি ভেবে কুণ্ঠিত কণ্ঠে মনীষা প্রশ্ন করল—হোটেলের সবাই বলছিল আপনি নাকি একজন লেখক। তাই কি?

—ঠিক লেখক বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে সময় পেলে

একটু আধটু লিখি আর কি।

—আপনি লেখক? সহসা নিজের মনেই যেন বলতে লাগল মনীষা—মানুষের মনকে নানাভাবে, নানাদিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করাই আপনার কাজ। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

—বলুন। সাধ্যে যদি কুলোয় নিশ্চয় দেবো।

—সতীত্ব কি দেহাশ্রয়ী? দেহটাই কি সব?

চমকে উঠলাম মনীষার কথা শুনে। মনে হল, এ যেন ওর গলার স্বর নয়। একটা অসহায় আর্তনাদ। একটা বুকফাটা হাহাকার।

একটু থেমে বললাম—এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ, আজো পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে সতীত্বের নিরিখ এক ধরনের নয়। কেউ বলেন—সতীত্বই হল নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কেউ আবার কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার কারো মতে সতীত্ব হল আসলে একটা সংস্কার মাত্র।

আজকের পৃথিবীতে সতীত্বের সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছে। এখনো তার কোন সু-মীমাংসা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হবে হয়তো! কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন বলুন তো?

—প্রশ্ন! মনীষার গলার স্বরে পরাজয়ের অসীম দৈন্য,—হ্যাঁ প্রশ্নই। জনমভর ঐ একটাই শুধু প্রশ্ন। কোন্‌টা বড়। স্বামী—না সতীত্ব! কিন্তু প্রশ্নটা আজো প্রশ্নই রয়ে গেল।

—কোন জবাব পান নি?

—না। মনীষা আনমনা। বেশ বোঝা যায় সারা মনে তার ঝড় উঠেছে। উদ্দাম ঝড়।

একটু থেমেই আবার সে বলল—একথা ঠিক যে স্বামী আর সতীত্ব দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোনমতেই আলাদা ভাবা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মনে করে—সতীত্বের চেয়েও তার স্বামী বড়, তবে?

চট করে জবাব দিতে পারলাম না। একটু ভেবে নিয়ে বললাম—

এটা হল ব্যক্তিগত রুচির কথা। অর্থাৎ যার কাছে যেমন। তবে আমার মনে হয়, সব কিছুই নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। পরিস্থিতি মানুষকে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভুল পথে চলতে বাধ্য করে। সেক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা মার্জনা তার পাওয়া উচিত। তবে বিশদভাবে না জেনে এ বিষয়ে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

—শুনবেন! মনীষা অন্যমনস্কভাবে বলে,—হ্যাঁ আপনার শোনা উচিত। আপনি লেখক। মানুষের মনের আনাচে কানাচে আপনার নিঃশব্দ বিচরণ। আপনিই হয়তো বুঝবেন যে—কেন এই দুঃসহ জ্বালা। কেন এই দ্বন্দ্ব। কিসের বাধা!

শেষ পর্যন্ত মনীষা আমাকে কোন কিছুই লুকোয়নি মল্লিকা। সব কথাই সে খুলে বলেছিল। একটি একটি করে। বড় তীব্র মনে হয়েছিল সেদিন সমুদ্র গর্জনটাকে। মনে হয়েছিল সমুদ্রের ঐ অতল জলের বুকে যেন বড় বেশি ব্যথার কাজল মাখানো। সে ব্যথার বুঝি শেষ নেই। সীমাও নেই।

একটু বাদেই মনীষা বলতে শুরু করল। এ কাহিনী আমার নয়! আমার এক বান্ধবীর।

ধরুন তার নাম ছিল—জয়ন্তী। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। সংসারে আপন বলতে একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ ছিল না তার।

অবশেষে একদিন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এল।

ফলও হাতে হাতেই মিললো। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিতার হাত ধরে জয়ন্তীও একদিন সেই জলস্রোতের মধ্যে মিশে গেল। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে অবশেষে একদিন এখানে এসে পা দিল, তখন কতই বা বয়স তার! পনেরো বছরের অপুষ্ট দেহের রেখায় রেখায় তখন ছটি ঋতুর ভাঙা-গড়ার খেলা শুরু হয়েছে সবে মাত্র।

এখানে ওখানে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত একদিন ঠাঁই মিললো শোভাবাজারের একটা পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়িতে।

প্রায়ান্ধকার একখানি ভিজে স্যাঁতসেঁতে ছোট ঘর। রান্নার জায়গা নেই। ভাড়া বাইশ টাকা।

সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। কিশোরী মনের ঘুম ঘুম চোখে তখন নতুন কুঁড়ির স্বপ্ন।

আকাশে যেন অনেক রঙ। অনেক রামধনু। মনের পক্ষীরাজ যেন কল্পনার সাতরঙা ঢেউ তুলে পাখির মত আকাশে ডানা মেলতে চায়। উড়ে যেতে চায়।

দিন যায়। মাস যায়। বছরও বুঝি ঘুরে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে, যেন আর আগেকার সেই জয়ন্তী নেই।

সবার অলক্ষ্যে দেহের মধ্যে কি যেন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে তার। সেই কিশোরী জয়ন্তী নিজের অগোচরেই কখন যেন যৌবনের ভরা দীঘির ঘাটে এসে পা বিছিয়ে বসেছে।

ভয়ে আনন্দে জয়ন্তী তখন দিশেহারা।

একি রহস্য! সারা অঙ্গ জুড়ে নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার মত একি বাঁধভাঙা দুরন্ত যৌবন!

এত আনন্দ, এত লজ্জা, এত ভয় সে রাখবে কোথায়!

প্রথম যৌবনের সেই এক-একটা পলাশরাঙা দিন। মনে মনে কতো কি সবুজ মিষ্টি নেশা লাগানো। কত আশার জালবোনা।

পৃথিবী বড় সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর পৃথিবীর এই মানুষগুলি। দেখে দেখে আশা আর মেটে না।

আবার অকারণেই যেন মনটা এক সময়ে উদাস হয়ে যায়। কেন এমন হয় জয়ন্তী ভেবেই পায় না। মাঝে মাঝে সে তখন জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় বাইরে।

সামনের বড় পাঁচিলটাতে হোঁচট খেয়ে খেয়ে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়, তবু তারই ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে দূরের ঐ একফালি নীল

আকাশের দিকে। চোখে তার কতো কী না-বলা ভাষা। সারা মন জুড়ে বিরাট এক শূন্যতা।

কি যেন নেই। কি পেলে যেন ভরে ওঠা যায়।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখতে দেখতেই অভাবের দিনগুলি উঁচু করে এগিয়ে এল।

শুধু অভাব আর অভাব। দুঃখ আর দারিদ্র্য। ক্ষুধা আর উপবাস।

বাবা ছিলেন বিক্রমপুরের এক স্কুলমাস্টার। ভেবেছিলেন কোনরকমে একবার তীরে এসে পৌঁছতে পারলে কাজ যা হোক একটা জুটে যাবে। আর কিছু না হোক স্কুলের একটা কাজ যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত হবে না। সেই আশাতেই তিনি এখানে-ওখানে আবেদন পাঠাতে শুরু করেছিলেন নিরলসভাবেই। আশা—একদিন তাঁর ডাক আসবেই।

ডাক আজো আসেনি। কোনদিন আসবে কিনা কে জানে!

বাবা তবু আশা ছাড়েন নি। মানুষ হিসাবে চিরদিনই তিনি আশাবাদী। তখনো তিনি সমানে আবেদন পাঠিয়ে চলেছেন এখানে-ওখানে। এমন কি মফঃস্বলের স্কুলগুলি পর্যন্তও বাদ গেল না।

কিন্তু কলকাতা শহরটা অনেক বড়। কে চেনে এখানে পদ্মা-পারের এক স্কুলমাস্টার অনন্ত দত্তকে। কেউ না! কোন জবাবই আসে না।

একদিন বাবার হাতে কত শত শত ছেলে মানুষ হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সময় তাদেরও কোন সাড়া মিললো না।

তবু বাবার আশার শেষ নেই। একদিন নাকি তাঁর ডাক আসবেই। নিশ্চয় আসবে।

আশ্বস্ত হতে পারে না জয়ন্তী। কি করে পারবে। দারিদ্র্যের কঠোর নগ্ন রূপ এরই মধ্যে ভয়ানকভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ক্ষুধা। অসহনীয় ক্ষুধা। শুধু নিজের নয়। বাবার চোখেও সেই একই ভয়াবহ বুভুক্ষার ছায়া।

কি করে সে ঠেকিয়ে রাখবে এই আসন্ন দুর্যোগকে।

সে সাধ্য তার কোথায়?

অনেক উপায় খুঁজেছে জয়ন্তী। অস্থির অশান্ত বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে রোজ সে রাতের প্রহরগুলোকে ভারী করে তুলেছে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি।

অবশেষে একদিন বাধ্য হয়েই জয়ন্তী বাইরে পা বাড়াল আশা উদ্বেগ বুকে নিয়ে! কাজ চাই। যে কোন কাজ। যে কোন পারিশ্রমিক।

মাত্র তো দুটি প্রাণী। সামান্য পারিশ্রমিক পেলেই তাদের চলে যাবে।

ভুল ভাঙতে দেরি হল না। কোথায় কাজ?

কতটুকু মূল্য সামান্য ম্যাট্রিক পাশ জয়ন্তী দত্তর। এই সামান্য বিদ্যার সম্বল নিয়ে চাকরির প্রত্যাশা করা আর পাথরের বুকে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাওয়ার মধ্যে বুঝি কোন তফাতই নেই।

তা' বলে শুভার্থীর অভাব হল না। অযাচিত ভাবেও এগিয়ে এলো কেউ কেউ। মুখে তাদের অসংখ্য প্রতিশ্রুতি। তারা সবাই কাজ দিতে চায়। যেন কাজ দিয়ে মেয়েদের উপকার করাটাই তাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ।

ভয়ে শিউরে ওঠে জয়ন্তী। আস্তে আঁচলটা টেনে দেয় বুকের উপর। কাঁপতে থাকে থর থর করে।

লোকগুলোর ভাব-ভঙ্গীতে যেন কিসের একটা ভয়ঙ্কর আভাস। মার্জিত খোলসের ভেতর থেকে যেন একটা অমার্জিত স্থূলতা উঁকি দেয় ক্ষণে ক্ষণেই।

আর কি কুৎসিত কদর্য হাসি। ভাবলেও যেন গা-টা ঘিন ঘিন করে ওঠে। ভালো ভাবে খেতে পরতে পারার মূল্য যে এতখানি দিতে হয়, তা ইতিপূর্বে কোনদিনই জানা ছিল না তার।

তবু হাল ছাড়েনি জয়ন্তী। যেখানে ডিগ্রীর প্রশ্ন নেই এমন বহু জায়গাতেই সে চেষ্টা করেছে। কাজও করেছে টুকিটাকি।

গেঞ্জির কারখানা, সুতোর কল, বোতামের ফ্যাক্টরি—কিছুই বোধ হয় সে বাদ রাখেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি কোথাও।

সর্বত্রই ঐ উপকারী দল। না চাইলেও তারা উপকার করতে চায়। আলাপ জমাতে চায়। চায় আরো অনেক কিছু। জয়ন্তীর পক্ষে তাদের সেই উপকার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে এক-এক দিন কেমন যেন কান্না পেতো জয়ন্তীর। যৌবন তো নয়, এ যেন মস্ত বড় একটা অভিশাপ।

কি করবে সে এই দেহভরা যৌবন নিয়ে।

কোথায় পালাবে?

কোথায় লুকোবে?

সবার নজর এই দেহটার দিকেই। এ বোঝা যে তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন।

তবু চেষ্টা করেছে জয়ন্তী। ক্ষুধা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। ক্ষুধা আইন মানে না, নীতি মানে না, সংযমের বাঁধও বুঝি মানতে চায় না কোন কোন সময়ে! সুতরাং চেষ্টা না করে উপায় কি!

অবশেষে একদিন একটা ইন্টারভিউর ডাক এলো। টাইপিস্টের চাকরি!

কিন্তু সব বৃথা। এ ব্যাপারে কতটুকু অভিজ্ঞতা জয়ন্তীর। ব্যক্তিগত সুপারিশপত্রের জোরই বা কোথায়। সুতরাং···

তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে নামতে আত্মগ্লানিতে বুকটা বুঝি জ্বলে যায় জয়ন্তীর। কি দরকার ছিল এখানে এসে। এ তো জানা কথাই।

শোভাবাজার অনেক দূর। আবার তো এতটা পথ হেঁটেই যেতে হবে।

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল জয়ন্তী। সামনেই এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে একটি যুবক। এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই মুখর হয়ে ওঠে যুবকটি।

"আপনার নামটা কি বলুন তো?"

ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে একবার মাত্র তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তর তর করে নেমে গেল জয়ন্তী। আর ফিরেও তাকালো না।

এই নির্মম গ্লানিময় জীবনে আজ পুরুষকে সে বেশ ভালো করেই চিনেছে। ওদের দেহের পরতে পরতে শুধু লোভ। কেবলি সর্বনাশের চিন্তা।

ওরা সবাই এক। সবাই সমান।

এক আকাশ দিনান্তের ম্লান আলো মাথায় নিয়ে পায়ে পায়ে এক সময়ে শোভাবাজারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাল জয়ন্তী। সারা দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন। পা চলতে চায় না। এখনো খানিকটা পথ বাকী বাসায় পৌঁছোতে।

সামনেই গঙ্গা। বর্ষার গঙ্গা একেবারে ভরা। চারদিকে শুধু জল আর জল। থৈ থৈ করছে।

সহসা কি ভেবে কাছে এগিয়ে গিয়ে স্থির অপলক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে রইল জয়ন্তী। মাথার মধ্যে এলোমেলো সব চিন্তা। দুর্বহ জীবন। প্রাণ ধারণের গ্লানি অসহ্য।

কি লাভ এই নিত্য নতুন অপমান কুড়িয়ে।

তার চেয়ে গঙ্গার এই অতল তলে তলিয়ে গেলে কেমন হয়?

কি এমন ক্ষতি! কতটুকু লোকসান হবে সংসারের? কিছুই না।

হ্যাঁ, সেই ভালো!

কিন্তু বাবা?...

সহসা চমকে ওঠে জয়ন্তী। বাবার কি হবে। নির্বান্ধব সংসারে এক জয়ন্তী ছাড়া তাঁর যে আর কেউ নেই!

না না, মরতে সে পারবে না। বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন

তাকেও বেঁচে থাকতে হবে। ক্ষুধার অন্নও যেমন করে হোক তাকেই যোগাড় করতে হবে। বাবার যে আর কেউ নেই!

অথচ একদিন সবই ছিল। অনেক বিস্মৃতির অতল থেকে জেগে ওঠে সে স্মৃতি আজো বুঝি ক্ষণে ক্ষণেই চোখ দুটোকে ঝাপসা করে দেয়।

স্মৃতির দুয়ারে অবিস্মরণীয় সেই দিনগুলি। অনুরাগে গভীর। বেদনায় মধুর। তাকে ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

মনে পড়ে বড়দার কথা। প্রাণ খুলে হাসতেন, কথা বলতেন অনর্গল। সবাই বলতো, আধপাগলা।

বাবা বিশ্বাস করতেন না। বলতেন—আগুন। ওর ভেতরে সর্বক্ষণ একটা আগুন জ্বলছে। সেই আগুনটাকে ও এমনি করেই ছাই চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

বাবার অনুমান মিথ্যে হলো না। একদিন সেই আধপাগল লোকটাই হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন ফাঁসীর মঞ্চে। মুন্সিগঞ্জের অত্যাচারী দারোগাকে তিনি নাকি হত্যা করেছেন নিজের হাতেই। পরাধীন দেশে এ অপরাধ গুরুতর।

আশ্চর্য! বাবা সেদিন একবারও কাঁদেননি। এতটুকুও বিচলিত হননি। শুধু নিজের মনেই একবার বিড় বিড় করে বলেছিলেন—জলে আগুন নেভে না। সব যাবে। সব যাবে। আগুনের জ্বালায় সব কটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বাবার আশঙ্কাই সত্যি হলো। তারপরই গেলেন মেজদা। আন্দামানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

মা কোনদিনই সে খবর জানতে পারেননি। বাবাই জানতে দেননি।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জানতেন—মেজদা আবার ফিরে আসবেন।

সবশেষে ছোড়দা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মিলিটারীর গুলিতে গোটা দেহটাই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তার।

শুধু বড়দা, মেজদা বা ছোড়দাই নয়। সারা গ্রামটাই বুঝি সেদিন এমনি করে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেকি উন্মাদনা! সেকি একাগ্রতা! মনে হলে আজো যেন শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসে।

আর আজ? আজ সেই মানুষ নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। যবনিকার অন্তরালে আজ তারা বিগত, বিস্মৃত, মৃত।

নীল সমুদ্র। আকাশের নীল ছায়া তার সঙ্গে মিশে গেছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়। আবার সরে সরে যাচ্ছে।

নির্জন সমুদ্র-সৈকতের দিগন্তহীন নিরালায় বসে আছি শুধু আমি আর মনীষা।

একটা উড়ন্ত মাছ জল থেকে কয়েক ফুট লাফিয়ে উঠেই আবার জলে পড়ে যায়।

মনীষা তাকিয়েও দেখে না। মনে হয় স্মৃতির কতকগুলো এলোমেলো ছবি যেন তার চোখের সামনে দুলছে।

একটু থেমেই আবার মনীষা বলতে লাগল—জয়ন্তী ফিরে গেল। আজ মনে হয় ফিরে না গেলেই যেন সে ভাল করতো। সেদিন বর্ষায় ভরা গঙ্গার অতলে নিজেকে তলিয়ে দিতে পারলে আজ আর বোধ হয় তাকে এমনি করে অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হতে হতো না।

গলির মাথায় গিয়েই জয়ন্তী অবাক। আশ্চর্য! একটা সুদৃশ্য দামী গাড়ি গোটা গলির মুখটাকে যেন জুড়ে রেখেছে।

কিন্তু ব্যাপার কি! এখানে এমন দামী গাড়িতে কে এলো?

বারো ঘর তেরো উঠোন। নানা জাতের নানা পেশার মানুষ। এখানে তো এমন গাড়ি আসবার কথা নয়।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে সহসা কি দেখে বিস্ময়ের ধাক্কায় থমকে দাঁড়াল জয়ন্তী। আশ্চর্য, ঘরে বসে আছে অফিসের সিঁড়িতে দেখা সেই লোকটা।

সামনেই বাবা। দিব্বি গল্পগুজবে মত্ত। মনে হয় যেন কতকালের চেনা। কত আপন জন।

জয়ন্তী বিমূঢ়। ও লোকটা এখানে কেন! কি মতলব ওর?

—এই যে মা। সহসা জয়ন্তীকে দেখেই বাবা উল্লাসে ফেটে পড়লেন—তোর কথাই হচ্ছিল। তুই তো ওকে চিনতেই পারিসনি। ও কিন্তু তোর আবেদনপত্র থেকে ঠিকানা যোগাড় করে ঠিক চলে এসেছে।

—জয়ন্তী নির্বাক। কে এই লোকটা! মনে হয় বাবার চেনা কেউ। কিন্তু কে হতে পারে!

—চিনতে পারলি নে তো। আর চিনবিই বা কি করে! আজকের কথা তো নয়। সেই কবেকার কথা। তাছাড়া দেখাশোনাও নেই অনেক দিন। আরে, আমাদের দেবু! দেবব্রত চৌধুরী। আমাদের অনাদি চৌধুরীর ছেলে। তোর ছোড়দার বন্ধু। রোজ সকালে আমার কাছে পড়তে আসতো। মনে নেই? মস্ত বড় অফিসার হয়েছে এখন। তুই যেখানে গিয়েছিলি তার পাশের অফিসেই কাজ করে।

মুখ তুলে তাকাতে পারে না জয়ন্তী। দেখতে দেখতে লজ্জার আভা ফুটে ওঠে ওর ফর্সা গালে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! দেবুদাকে সে চিনতেই পারেনি। যদিও অনেকদিন বাদে দেখা, তবু চেনা উচিত ছিল।

আড়ালে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জয়ন্তী। দেবুদার সঙ্গে কি রূঢ় ব্যবহারই না সে করেছে।

দেবুদা কি ভাবলেন কে জানে। ভাবাই তো স্বাভাবিক। ভুল তারই। আর যাই হোক, অন্য দশটি লোকের মত দেবুদা নন।

তার উজ্জ্বল দৃষ্টিতেই যেন ভেতরের চেহারাটা স্পষ্ট নজরে পড়ে। তার প্রতি এতটা রূঢ় হওয়া সত্যিই খুব অন্যায় হয়েছে।

যথা সময়ে চা নিয়ে এগিয়ে গেলেও জয়ন্তী কিন্তু কিছুতেই পারল না মুখ তুলে তাকাতে। কোন রকমে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে পালিয়ে গেল আগের জায়গায়।

ছেলেবেলায় এই দেবুদাকে কতদিন কত ভাবে সে দেখেছে। আবদার বা অত্যাচারও কম করেনি।

আজ সে সব দিন শেষ হয়ে গেছে। সেই মানুষ আছে, সেই দেবুদা আছে। সেই জয়ন্তীও আছে—নেই শুধু সেই মন।

আজকের দেবুদা অনেক বড়।

আর জয়ন্তী? আজকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জয়ন্তীর মধ্যে সেদিনের সেই প্রাণচঞ্চল ছোট্ট জয়ন্তীকে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাবা চিরদিনই সদানন্দ লোক। কথা বলার লোক পেলেই তিনি মুখর হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। এতদিন বাদে প্রিয় ছাত্রকে কাছে পেয়ে কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না তাঁর।

কত কথা। নিজের কথা, পরিচিত পাঁচজনের কথা, অনূঢ়া কন্যার জন্য নিজের দুর্ভাবনার কথা—এমনি হাজার হাজার কথা।

সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে দেবুর কথা। একান্ত প্রিয় ছাত্র দেবু আজ বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে। এ আনন্দ প্রকাশের বুঝি ভাষা নেই তাঁর।

দেবুদার তুলনা হয় না। লোক হিসেবে বরাবরই তিনি সংযত, ভদ্র ও মার্জিত। বিদায় নেবার আগে বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে একটি কথারই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন বার বার—আপনি অবশ্যই একবার আমাদের বাড়ি যাবেন মাস্টার মশাই। মা সব সময়ই আপনার কথা বলেন। ঠিকানা জানতেন না। জানলে আগেই খোঁজ খবর করতেন।

—নিশ্চয় যাবো। বাবা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠেন—একশবার যাবো। আমিই কি ছাই তোমাদের ঠিকানা জানতাম। জানলে কবে চলে যেতাম। আহা, তোমার মা-র কথা এখনো সব সময়ে মনে পড়ে। কি আদর-যত্নই না করতেন। ঠিক যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।

বিদায় নিয়ে সোজা দেবুদা বেরিয়ে গেলেন। কোনদিকে ফিরেও তাকালেন না।

তাকালেই নজরে পড়তো সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া একটি অসহায় আর্তমুখ। সে মুখ অনুতাপে ভরা। বেদনায় ম্লান।

পরদিন দেবুদাদের পাইকপাড়ার বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বাবার সে কি আনন্দ। দেবুদার মা সম্বন্ধে কত গল্প। কত সুখ্যাতি। মাস্টার মশাইয়ের কাছে নাকি তাঁর অনেক ঋণ।

নাম করা রক্ষণশীল পরিবার। দেবুদাই তাঁদের একমাত্র সন্তান। আজ সে বড় হয়ে উঠেছে নাকি একমাত্র মাস্টার মশাইয়ের আশীর্বাদের ফলেই। এমনি হাজার কথা—

—বুঝলি মা। সহসা কি একটা কথা মনে হতেই বাবা অধীর আনন্দে বললেন—দেখ্ দেখি দেবুর মা-র কাণ্ড! কিছুতেই ছাড়লেন না। জোর করে আমার হাতে একশটা টাকা তুলে দিলেন। দেবুর প্রথম মাসের মাইনে থেকে এ টাকাটা নাকি তিনি গুরু প্রণামী দেবেন বলে তুলে রেখেছিলেন। এদ্দিন দেখা হয়নি বলে দিতে পারেননি। হ্যাঁ, আর একটা কথা। শিগ্গিরই দেবুর বিয়ে। পাত্রী দেখা চলছে। তখন কিন্তু তোকে-আমাকে দু'জনকেই যেতে হবে। দেবুর মা বার বার করে বলে দিয়েছেন। যাক্, এই নে টাকাটা। তুলে রাখ।

একটি কথাও বলতে পারল না জয়ন্তী। অপরাধবোধের গ্লানিতে কে যেন তার মাথাটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল নিমেষেই।

সংসারটা তাহলে একেবারে নিষ্করুণ নয়। এক-আধটা মানুষের বুকে এখনো তাহলে স্নেহ-মমতার শ্যামল ঝরনাধারা বয়ে চলেছে।

ছোড়দার বন্ধু দেবুদার মধ্যে যে এতখানি মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কে ভেবেছিল। অথচ ভুল বুঝে তাকেই কি না সে আঘাত করেছে হৃদয়হীনের মতো।

উপরে নীল আকাশ। নিচে নীল সমুদ্র। রাশি রাশি ঢেউ ফেটে পড়ছে সাদা ফেনা ছিটকে। আথাল-পাথাল ঢেউ।

মনীষা নীরব। সহসা ঢেউয়ের দোলার মতই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। তারপর আবার বলতে শুরু করলো—

আশ্চর্য ছেলে দেবুদা। কর্মমুখর ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তার পরও তিনি অনেকদিন এসেছেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে আবার চলেও গেছেন।

কিন্তু কোনদিনও জয়ন্তীর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকুও প্রকাশ করেননি নিজেকে। যেন জয়ন্তীকে তিনি চেনেন না। তার ভালোমন্দ কোন কিছুতেই যেন তার কিছু আসে যায় না।

এমনও দু-একদিন হয়েছে—যেদিন বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি এসেছেন। কিন্তু মাস্টার মশাই নেই শুনে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে গেছেন। একমুহূর্ত অপেক্ষা করেননি। মাঝে মাঝেই এ নিয়ে জয়ন্তীর মনটা গুমরে উঠতো। কেন দেবুদার এই অদ্ভুত নীরবতা। তার রূঢ় ব্যবহারের জন্যই কি ?

নিশ্চয়ই তাই। নইলে শৈশবের সঙ্গিনী জয়ন্তীকে কি তার একবারও মনে পড়ে না। মনে পড়ে না বিক্রমপুরের সেই বনহরিণীর মত দুষ্টু মেয়েটাকে। যে মাঝে মাঝেই বইপত্র ছিঁড়ে দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো।

তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকী। তদুপরি সংসার খরচ। একশো টাকা আর কতক্ষণ !

দেখতে দেখতেই আবার যে-কে সেই ? সেই অভাব অনটন। সেই দুঃখ দৈন্য। সেই ভয়াবহ দারিদ্র্য।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে জয়ন্তীর। দাওয়ায় বসে উদাসী চোখ দুটি দূর আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে মনে মনে আকাশ-পাতাল কত কি সে ভাবে।

জীবনের এই বিরাট ছন্দপতনের মূলে রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা। বাবার এখনো কোন কাজ হয়নি। এ অবস্থায় কি করে চলবে? কি করে সে ঠেকিয়ে রাখবে এই অত্যাসন্ন দুর্যোগকে?

সামনের দিকে তাকাতে গেলে নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই যে নজরে পড়ে না।

ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখের কোল গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে টেরও পায় না জয়ন্তী।

হঠাৎ কি দেখে সে চমকে ওঠে দারুণ ভাবে।

আশ্চর্য! সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন দেবুদা। সারা মুখে তাঁর গভীর মমতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। অপরিসীম ব্যাকুলতা।

—কি হয়েছে জয়ন্তী?

এতদিন বাদে স্নেহের এই তরঙ্গায়িত স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গেই স্থান কাল পাত্র ভুলে হু-হু করে কেঁদে ওঠে জয়ন্তী। কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার হালকা দেহটা। পারছে না—আর কিছুতেই সে পারছে না এই দুঃসহ অবস্থাকে মেনে নিতে—মানিয়ে নিতে। এই দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার থেকে আজ সে চিরদিনের মতই নিষ্কৃতি পেতে চায়।

দেবুদা নীরব। নিমেষেই বুঝি অতীতের সেই মনটা আবার ফিরে এলো স্নেহ-প্রীতির মাধুর্য নিয়ে। একটু হেসেই বললেন—কি হয়েছে আমাকে খুলে বল জয়ন্তী।

কি বলবে জয়ন্তী। এ অপমান ও দীনতার কথা বলার মত ভাষা তার কোথায়।

আর কোন কথা না বলে কাঠের পুতুলের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেবুদা। রুদ্ধ অভিমান বুকে নিয়ে এতদিন জয়ন্তীর কাছে সে শুধু নিজেকে কঠোর করবার সাধনাই করে এসেছে। কিন্তু শৈশব-সঙ্গিনী জয়ন্তী যে আজ ভেতরে ভেতরে কত নিঃস্ব, তা এমন করে বুঝি আর কোনদিনই তার চোখে ধরা পড়েনি।

বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নের মত দিনগুলো আসে আর যায়। কোন আনন্দ নেই। আবেগ নেই। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন—শুধু অভাব আর অভাব।

দেবুদা ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার এসেছেন, কিন্তু কোনবারই এ নিয়ে আর কোনরকম উচ্চবাচ্য করেননি। কেমন যেন একটু গম্ভীর। বেশ বোঝা যায়, কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তার ভেতরে ভেতরে।

হঠাৎ একদিন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু খটকা লাগে জয়ন্তীর। ক'দিন থেকে বাবাও যেন একটু আনমনা। কিছু যেন একটা ভাবছেন মনে মনে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না।

—কি হয়েছে বাবা? জয়ন্তীর প্রশ্ন।

—হবে আবার কি! কথার মধ্যেই বাবার উদ্বেগটা ধরা পড়ে—দেবুটা বড় ভাবিয়ে তুলেছে মা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। ওর বাবা সেকেলে রক্ষণশীল লোক, অবস্থাও ভাল। ঐ একটিমাত্র ছেলে। সে রাজী হবে কেন?

জয়ন্তী অবাক। কি ব্যাপার। কি বলতে চাইছো বাবা? অস্পষ্ট ভাসা ভাসা কথাগুলো থেকে কিছুই যে বোঝা যায় না। কি হয়েছে দেবুদার?

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়; আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল জয়ন্তীর জন্য। সেটা প্রকাশ পেল দিন কয়েক বাদে।—এক স্বপ্নভরা সন্ধ্যায়।

সেদিন জয়ন্তী বাসায় একাই ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মত হাজির হলেন দেবুদা। কোনরকম ভূমিকা না করেই তিনি বললেন—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই জয়ন্তী।

কথার ধরন দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে জয়ন্তীর।

—জানো বোধ হয় আমার বিয়ের চেষ্টা চলছে। পাত্রী দেখাও

চলছে। এ ব্যাপারে আমার মতামত আমি মাস্টার মশাইকে জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি তোমার দিক থেকে কোনরকম আপত্তি হবে না।

জয়ন্তী স্তম্ভিত। চোখের সামনে তার কেমন যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে, মিলে মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বাবা কি সেদিন এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন? এ যে কল্পনাতীত!

—আশা করি আপত্তি নেই? দেবুদার দুচোখে অসীম প্রত্যাশা।

—না না। দুহাতে মুখ ঢেকে সহসা ভেঙ্গে পড়ে জয়ন্তী।

অসম্ভব। কি আছে তার। অর্থ নেই, বিত্ত নেই, আভিজাত্য নেই। বলতে গেলে কিছুই নেই তার। জীবনের খরস্রোতে সে ভেসে চলেছে ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে। দেবুদা মহৎ। তাকে দেবার মত তার কিছুই নেই।

তাছাড়া একমাত্র সন্তানকে কেন্দ্র করে দেবুদার বাবা-মা যে স্বপ্নজাল বুনে চলেছেন, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবার কি অধিকার আছে তার?

—তোমার আপত্তির কারণ? দেবুদা গম্ভীর।

কোন জবাব দিতে পারে না জয়ন্তী। তার উনিশ বছরের বুকের মধ্যে এমন দাপাদাপি বোধ হয় আর কোনদিনই সে উপলব্ধি করেনি।

দেবুদার কথাটা যে তার কত বেশি আনন্দের, সে কথা তিনি নিজেও হয়তো জানেন না।

কিন্তু জয়ন্তী যে বড় দুর্বল। এত বড় সম্পদ সে রাখবে কোথায়?

না না, অসম্ভব! তাকে করুণা করতে গিয়ে কিছুতেই সে দেবুদাকে এমন করে ব্যর্থ হতে দেবে না।

—বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি করুণা করতে চাইনি জয়ন্তী। আমার স্থির সিদ্ধান্তের কথাই বলেছি। আর এ সিদ্ধান্তও আমার

আজকের নয়। এ সিদ্ধান্ত আমি সেদিনই করেছিলাম—যেদিন অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভুল বুঝে তুমি আমাকে আঘাত করেছিলে।

পাখির মত নরম বুকটা কেঁপে ওঠে জয়ন্তীর। বুজে আসে কালো দীঘির মত দুটি স্বপ্নভরা চোখ।

ভয়ে নয়—উদ্দামতায়। উচ্ছ্বাসের উদ্দামতায়।

নিজের মনকে সে জানে। তবু দেবুদাকে এতখানি নিচে নামাতে মনটা যেন কিছুতেই সায় দেয় না।

দেবুদা অনেক বড়। দুরধিগম্য। নাগালের বাইরে তার স্থান। পথের ধুলোয় তাকে মানায় না।

দেবুদা নিশ্চুপ। দেখতে দেখতে তার মুখখানি কালো হয়ে ওঠে আশাহত বেদনায়। তারপর কি ভেবে বললেন—বেশ, আমি যাচ্ছি। তবে সংসারে এমন লোকও আছেন, যাঁকে তুমি কোনদিনই ফেরাতে পারবে না। সাধ্য তোমার নেই।

কথাটা বলে আর কোনদিকেই তাকালেন না দেবুদা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্তী বসে থাকে একা। মন তার বিকল বিবশ হয়ে গেছে। কি যেন হারিয়ে সে দেউলে হয়ে গেছে। তবু অজ্ঞাতেই কখন তার কামনা ঝরে পড়ে—ক্ষমা করো দেবুদা। তুমি মহৎ। স্বার্থপরের মত কিছুতেই পারলাম না তোমাকে পথের ধুলোয় টেনে নামাতে। আমায় ক্ষমা করো।

সেই যে দেবুদা চলে গেলেন, দীর্ঘদিনের মধ্যেও আর এলেন না।

জয়ন্তী মনকে সান্ত্বনা দেয়। এই তো ভালো। জীবন আজ বিভ্রান্ত। এই নোনাধরা ধ্বংসস্তূপ থেকে দেবুদার সরে থাকাই তো উচিত।

না না, দেবুদা ঠিকই করেছেন। এখানে আর কোনদিনই তাঁর আসা উচিত নয়।

কিন্তু সব বৃথা।

খেলায় নেমে নিজের হৃদয়কে ফাঁকি দিতে পারেনি জয়ন্তী। তাই মনকে হাজার ভাবে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও চোখে একটা চঞ্চল প্রতীক্ষা জেগে থাকে সর্বক্ষণ।

কখন শোনা যাবে একটি পরিচিত পদধ্বনি।

কখন আসবেন দেবুদা।

নিশ্চয়ই আসবেন। ভুল বুঝে কিছুতেই তিনি দূরে থাকতে পারবেন না।

কত দিন, কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি এমনি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কেটে গেল, কিন্তু দেবুদা আর এলেন না।

এলেন আর একজন।

জয়ন্তীর দুচোখে অপরিসীম বিস্ময়।

কে ইনি? কি উজ্জ্বল প্রশান্ত দুটি চোখ। স্থির শুভ্র প্রশান্ত কপালের উপর কি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা।

পরনে গরদের শাড়ি। কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর-রেখা। দেখলেই যেন মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে।

—তুমি জয়ন্তী?

জয়ন্তী ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ে।

—আমি দেবুর মা। তোমারও মা।

—মা! চোখে যেন আর পলক পড়ে না জয়ন্তীর।

—হ্যাঁ, তোমার মা! ওদিকে পাগল ছেলে মুখভার করে বসে আছে। তাইতো নিজেই এলাম আমার বৌমাকে নিয়ে যাবো বলে। তোমার কথা না পেলে তো আমি আজ কিছুতেই যাবো না মা!

মা! বৌমা!

প্রণাম করতে গিয়ে পায়ে মাথা রেখে সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জয়ন্তী। বুকের ভেতরে যেন কত কালের কত যুগের একটা বিস্মৃত-প্রায় উৎসের মুখ খুলে গেছে। দূর হয়ে গেছে সমস্ত ভয়, আতঙ্ক আর উদ্বেগ।

বৌমা! সেদিন দেবুদাকে ফিরিয়ে দিলেও এই স্নিগ্ধ আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করবার সাধ্য তার নেই।

কিছুক্ষণ পরেই দেবুদার মা ফিরে গেলেন। জয়ন্তী ঠায় বসে রইল একা।

বুকে আনন্দ আর ভয়ের ধুক্‌পুক্‌। বুভুক্ষু মন আর বঞ্চিত দেহ কাঁপছে থর থর করে! জীবনের একমাত্র কামনা যে হঠাৎ এভাবে পূর্ণ হবে তা কে জানতো! সে নিজেই কি ভাবতে পেরেছিল কোনদিন।

ভাবতে ভাবতে একসময় উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী। এত বড় সৌভাগ্যের খবরটা সে তার ছোট বুকে লুকিয়ে রাখবে কি করে. মনের কথাটা আর কাউকে না বলতে পারলে কিছুতেই যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

কিন্তু কাকে বলবে!

বান্ধবী অনুপমাকে?

হ্যাঁ, তাকেই সে বলবে।

পাশের বাড়ির মেয়ে অনুপমা। সংসারে ঐ একটিমাত্র লোক—যার কাছে সে নিজের মনের সমস্ত কথা উজাড় করে দিতে পারে।

পশ্চিম আকাশ লালে লাল। তারই রঙ সর্বত্র প্রতিফলিত।

আকাশে রং, মাটিতে রং, জলে রং, স্থলে রং, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু রং আর রং!

মনীষার সারা মুখে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। মনে হয় যেন কোন অরণ্যের ছায়া নিবিড় ছবি নেমে এসেছে তার চোখের তারায়।

সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া দিয়েছে। এলোমেলো উদাস হাওয়ায় বিস্মৃত কপালে নেমে আসা অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে মনীষা বলতে লাগল—

তারপর একদিন বিয়ের তারিখ ধার্য হলো।

জয়ন্তীর সারা মনে পূর্ণতার জোয়ার। চোখে অজস্র স্বপ্ন। নতুন ঘর আর নতুন জীবনের স্বপ্ন।

কবে সেই শুভলগ্ন আসবে। কবে?

অবশেষে এলো সেই শুভক্ষণ। মিলনের আঙিনায় জয়ন্তী জীবনের ডালি তুলে দিল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর হাতে। প্রেমের প্রাচুর্য দিয়ে স্বামীও তাকে বরণ করে নিলেন অতি প্রিয়জনের মতো। জয়ন্তী ধন্য হল।

বিধাতা রসিক পুরুষ। তাঁর হাসি নাকি কেউ দেখতে পায় না। পেলে এই মুহূর্তে জয়ন্তী বোধ হয় আতঙ্কে শিউরে উঠতো।

বিয়ের পরদিনই জয়ন্তী তার স্বামীগৃহের দিকে পা বাড়াল।

মনে কত আনন্দ। কত ভয়। কত দ্বিধা। কত কুণ্ঠা।

শ্বশুরমশাই রাশভারী লোক। এ বিয়েতে নাকি তাঁর মোটেই মত ছিল না।

ছেলের গোঁ এবং স্ত্রীর আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত মত দিলেও মনে মনে নাকি তিনি এতটুকুও খুশি হতে পারেননি।

সেকি পারবে তাঁকে মানিয়ে চলতে? সবাইকে আপন করে নিতে?

আবার নিমেষেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে জয়ন্তী।

হ্যাঁ, সে পারবে। তাকে পারতেই হবে।

স্বামী তার কত বড়, কত মহৎ। সে তো তার তুলনায় কিছুই নয়।

পিতার প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি তাকে ঠাঁই দিয়েছেন আপন মহানুভবতায়।

তার মর্যাদা সে রাখবে।

ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সেবাযত্ন দিয়ে—যেমন করে হোক্ সে সবাইকে জয় করে নেবে।

কাউকে এতটুকু দুঃখ পেতে দেবে না। কারো গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগতে দেবে না সে।

সুখের পরে দুঃখ। আবার দুঃখের পরে আসে সুখ।

সংসারে জীবন নাট্যের রথচক্রে পিষ্ট জয়ন্তীকে আজ আর চেনাও

যায় না। অতীতের সেই জয়ন্তী যেন আজ কোন মায়াকাঠির পরশে একেবারেই বদলে গেছে।

আজ তার চারপাশে সার্থকতার স্পর্শ। তার ব্যর্থ বিবর্ণ জীবনে হঠাৎ যেন এসে লেগেছে এক ঝলক বসন্তের হাওয়া, আর তারই স্পর্শে সে যেন দেখতে দেখতেই রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

শুধু কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাজ। কাজ ছাড়া আজ আর একমুহূর্তও বুঝি স্থির থাকতে পারে না জয়ন্তী।

এ তার নিজের সংসার। শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী—এঁরা তো তার একান্ত নিজস্ব। নিজের জিনিস কার উপর সে ভরসা করে ছেড়ে দেবে!

শাশুড়ী মনে মনে হাসেন। আহা, রূপেগুণে বৌমা যেন একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কি নিখাদ মমতায় ভরা প্রতিটি কাজ, কি নিপুণ পরিপাটি পরিচালনা।

চোখভরা স্নেহমমতায় গড়া স্বপ্ন নিয়ে মেয়েটা যেন এরই মধ্যেই গোটা সংসারটাকে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে।

এই না হলে বউ! এমন বউ দশজনকে দেখিয়েও সুখ।

শ্বশুর মশাই রাশভারী লোক। বুদ্ধির দীপ্তি ও ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্যে তাঁর নাগাল পাওয়া দায়। শেষ পর্যন্ত তিনিও কিন্তু এগিয়ে এলেন একটু একটু করে।

আড়ালে থেকে তাঁর প্রতিটি সুখ-সুবিধার প্রতি কে যে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছে, এটুকু অনুমান করে নিতে মোটেই দেরি হল না তাঁর।

অবশেষে তিনি নিজেই একদিন বৌমাকে কাছে ডেকে নিলেন অযাচিত ভাবে। বৌমা সত্যিই লক্ষ্মী। তাকে শতভাবে দেখেও বুঝি সেদিন আশা আর মেটেনি তাঁর।

দেখতে দেখতেই সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থা পালটে গেল।

বৌমা হাতপাখাটি নিয়ে কাছে না বসলে শ্বশুরমশাই কিছুতেই যেন খেয়ে তৃপ্তি পান না। কল্কের আগুনটি—তাও অন্যে দিলে চলবে না।

ধোপার হিসেব, সংসারের খরচপত্রের হিসেব, কাকে কি দিতে-থুতে হবে তার হিসেব, সে তো বৌমা ছাড়া একেবারেই অচল। আর কেউ করতে গেলে হিসেবে ঠিক ভুল হয়ে যাবে।

আর অবসর সময়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া—সে তো বৌমা ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।

মজাও এ নিয়ে কম হয় না। শাশুড়ী বৌমার মুখে একটু মহাভারতের পাঠ শুনতে ভালোবাসেন। জয়ন্তী হয়তো সবেমাত্র বইটা খুলে বসেছে, অমনি পাশের ঘর থেকে শ্বশুর মশাইয়ের ভারী গলার ডাক ভেসে এল—এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো বৌমা!

সঙ্গে সঙ্গেই শাশুড়ীর মুখ ভার। একি অন্যায় কথা। বৌমা কি ওর একার নাকি? আর কি কেউ তাকে কাছে পাবে না। এখন কেন! বিয়ের আগে তো দেখি কত ব্যাগড়া দেওয়া হয়েছিল!

সঙ্গে সঙ্গেই ভারী গলা ফোঁস করে ওঠে—ব্যাগড়া দিয়েছি বেশ করেছি। দরকার হলে আবার ব্যাগড়া দেবো। বৌমা, তুমি জল নিয়ে এসো।

জয়ন্তী মনে মনে হাসে। খুশি ও তৃপ্তির প্রসন্নতায় মন তার ভরে ওঠে কানায় কানায়।

সংসারে এই তো সে চেয়েছিল চিরদিন।

জীবনকে ক্ষয় করে নতুন জীবনের উপাদান গড়ে তোলার কঠোর সংগ্রামের সার্থকতার মধ্যেই তো নারী জীবনের যা কিছু গৌরব।

সেই কঠোর সংগ্রামে আজ সে বিজয়িনী। আজ তার মত সুখী কে?

পরিপূর্ণ সংসার। সার্থক জীবন।

পূর্ণতার ঝলমলানিতে জয়ন্তী আজ তৃপ্ত। ভরা।

সে ঘর পেয়েছে। নিরাপত্তা পেয়েছে। পেয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনাবিল স্নেহ, স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা। ব্যাস আর কি চাই!

অভাব শুধু ছোট্ট একটি দেবরের। না থাকলে অবকাশ মুহূর্ত-গুলিকে ঠিক যেন হাসিখুশিতে ভরে তোলা যায় না।

সে সাধও মেটে। দেবরের অভাব পূর্ণ করে পাশের বাড়ীর মিঠুয়া। পনের বছরের মিঠুয়া যেন অদ্ভুত প্রাণসম্পদে ভরপুর একটি বাঁধনহারা—উচ্ছল ঝরনাধারা।

আসে সে পাড়া কাঁপিয়ে।

হাসে গলা ফাটিয়ে।

সংসারের সব কিছুই যেন তার কাছে মস্ত বড় একটা হাসির ব্যাপার। এ বাড়ীতে তার অবাধ গতি। যখন তখন আসে। হৈ চৈ করে। নিজে হাসে, সবাইকে হাসায়। আবার একসময় নিজের মনেই ফিরে গিয়ে বইখাতা খুলে বসে। সামনেই তার স্কুল ফাইনাল।

অধুনা এক নতুন বাতিক হয়েছে মিঠুয়ার।

পাশাপাশি দুটি বাড়ী। মাঝে পাঁচিলের গায়ে ছোট একটি দরজা। দরজা সর্বক্ষণ প্রায় খোলাই থাকে।

ফলে সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে মিঠুয়ার। একটু ফাঁক পেলেই সে পালিয়ে আসে। বাড়ী গিয়েও যে সে খুব শান্ত থাকে তা নয়। জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে ক্ষণে ক্ষণেই হয়তো সে হাঁক দেয়—বৌদি!

তারপর কত কথা। এমন নাইস্ বৌদি নাকি এ পাড়ায় একটিও নেই। আর দেবুদা না বুঝিয়ে দিলে তো অঙ্কে সে লাড্ডু পেতো।

এ বাড়ীতে সবাই মিঠুয়াকে ভালোবাসে। বিশেষ করে শাশুড়ী তো মিঠুয়া বলতে একেবারে অজ্ঞান।

ভালোমন্দ খাবারটি নিজের হাতে মিঠুয়ার মুখে তুলে না দিতে পারলে কিছুতেই বুঝি তৃপ্তি হয় না তাঁর। বোঝাই যায় না যে মিঠুয়া এ বাড়ীর ছেলে নয়।

ভালোবাসে জয়ন্তীও। বেশ ছেলে মিঠুয়া। চঞ্চল দুটি দুষ্টুমি ভরা চোখ। স্বাস্থ্যদীপ্ত চেহারা। সবচেয়ে সুন্দর ওর মুখের ঐ বৌদি সম্বোধনটি। ভারী মিষ্টি লাগে জয়ন্তীর। এ বাড়ীতে এক

মিঠুয়া ছাড়া তাকে বৌদি ডাকবার আর কেউ নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর—তারপর আসে বিকেল।

বিকেল হলেই শিরায় শিরায় কেমন যেন একটা প্রলয়ের ডাক বেজে ওঠে জয়ন্তীর। অজ্ঞাতেই দুর্দম বেগে টানতে থাকে দুখানি সবল বাহুর প্রগাঢ় বেষ্টনী। একটি বলিষ্ঠ বুকের উত্তপ্ত স্পন্দন।

আর কত দেরি? কখন আসবেন উনি? স্ত্রীর গৌরব আজ তার সর্ব শরীরে। দেহের প্রতিটি রক্তকণায়। প্রতিটি স্পন্দনে।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও সন্ধ্যার এই সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত স্বামীকে সে নিবিড় করে পেতে চায়।

এই কয়েকটি মুহূর্ত তার একান্ত নিজস্ব। নিজের হাতে খাবারটি স্বামীর হাতে তুলে দিতে না পারলে মনে হয় সবই যেন মিথ্যে। সবই যেন শূন্য।

স্বামীর অবস্থাও তাই। জয়ন্তীর হাতের তৈরি খাবার না পেলে কিছুতেই যেন মন ওঠে না তার। মনে হয়, কি যেন একটা বাদ রয়ে গেল—অপূর্ণ রয়ে গেল।

কাণ্ড দেখে শাশুড়ী আড়ালে মুখ টিপে হাসেন। পাগল আর কাকে বলে। দুটোই সমান। আহা, চিরদিন ওরা এমনি করে মিলেমিশে থাকুক।

সমুদ্র অন্ধকারে ডুবছে। দিগন্তপ্রসারী বালুকাবেলায় নেমে এসেছে সন্ধ্যার স্তব্ধ প্রশান্তি।

মনীষা নির্বাক। থরথরে কাঁপুনিটা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল ওর দেহের পরতে।

অসম্ভব অস্থির মনে হচ্ছিল ওকে এই মুহূর্তে।

হঠাৎ মনীষার মুখে দেখা দিল অত্যন্ত দুঃখের এক মর্মরাঙা হাসি। একটু থেমেই আবার সে মুখর হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা নেমেছে—তাই না? পাইকপাড়ার বাড়ীতেও বোধ হয় এখন এমনি করে সন্ধ্যা নেমেছে। জয়ন্তীর হাতের শাঁখের শব্দে রোজ এ সময়ে গোটা চৌধুরী বাড়ীটা মুখর হয়ে উঠতো।

তুলসী তলার প্রদীপ দিয়ে রোজ এ সময়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে সে কামনা করতো স্বামীর সুখ ও সমৃদ্ধি।

মনে মনে বলতো—তুমি আমাকে ধন্য করেছ। আশীর্বাদ করো —আমি যেন তোমার সার্থক জীবনসঙ্গিনী হতে পারি। তোমার জীবনের যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি—সব যেন আমি পূরণ করতে পারি। তুমি মহৎ। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে রাত এগারটার আগে কোনদিনই জয়ন্তীর পক্ষে ঘরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। স্বামী জেগেই থাকতেন। এই মুহূর্তটির জন্যই বুঝি অপেক্ষা করতেন তিনি।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়তো। শুধু ঘুম আসতো না তাদের ছু'জনের চোখে।

পরিপূর্ণ এই নিটোল অবকাশ মুহূর্তে সারাদিনের সঞ্চিত সমস্ত আবেগ তারা মুক্ত করে দিতো একে অন্যের কাছে।

কত কথা। সম্ভব অসম্ভব, অবান্তর, অসংলগ্ন, কত কথা বলা। মনে হতো এই কথা বলা বুঝি জীবনে আর কোনদিনই শেষ হবে না।

সম্পূর্ণ ছু'জনের বাসনা-কামনা দিয়ে গড়া এ যেন একটা আলাদা জগৎ। এ জগতে অন্য কারোরই স্থান ছিল না।

দিনের পরে রাত্রি! আবার রাত্রির অন্ধকার এক সময়ে হারিয়ে যায় আলোর সমারোহে।

ভোরের কাকলী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতো জয়ন্তী।

চৌধুরী বাড়ীর ঘুমভাঙ্গার সময় আসন্ন। সবাই এবার জেগে উঠবে—একে একে। কতো কাজ পড়ে রয়েছে। নিজে হাতে সব কাজ না করলে তৃপ্তিও পাওয়া যায় না।

আবার সেই কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। এ ব্যাপারে এতটুকুও ক্লান্তি ছিল না জয়ন্তীর। এযে তার নিজের সংসার।

তবু কোথায় যেন একটুকরো হাহাকার বুকের মধ্যে গুমরে উঠতো

ক্ষণে ক্ষণে। রাত্রির প্রহরগুলো যেন বড় ছোট। বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

শাশুড়ী মহাখুশি! আহা, বৌমা যেন একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কোন ত্রুটি নেই তার কর্তব্যপালনে। সব দিকে তার সমান নজর। হ্যাঁ, এইতো চাই। এইতো হওয়া উচিত।

তবু তিনি মা। তাই সন্তানের অন্তরের ব্যথা বুঝি তার নজর এড়ায় না।

সন্দেহে পুত্রবধূর চিবুক ধরে একদিন তিনি বললেন—রাতদিন খালি কাজ আর কাজ। এভাবে খাটলে কখনো শরীর ঠিক থাকে? ঠিক আছে। সামনের ছুটিতে তোমরা দুটিতে মিলে পুরী থেকে কিছুদিনের জন্য ঘুরে এসো। আমি কর্তাকে ব'লে ক'য়ে মত করিয়ে দেবো।

খুশির ও তৃপ্তির অমৃত স্বাদে চোখে জল এসে যায় জয়ন্তীর। বলতে গেলে সংসারের এই কোলাহলের মাঝে আজো সে স্বামীকে তেমন করে পায়নি।

কবে সেদিন আসবে! কবে সে স্বামীকে একান্ত নিবিড় করে পরিপূর্ণ ভাবে কাছে পাবে! অফিস থেকে ফিরে এসে খবরটা শুনলে উনি আজ কি খুশিই না হবেন! ভাবতেও যেন ভাল লাগে।

সত্যিই উনি খুব খুশি হলেন। খুশির অন্য কারণও ছিল। সামনেই ছিল তাদের প্রথম স্মরণীয় বিবাহ-বার্ষিকী। দু'জনের দু'জনকে ঘিরে ভালোবাসা দিয়ে গড়া ঐ দিনটিকে তারা একান্তই নিবিড় করে পেতে চায়। সমুদ্র-সৈকতে বেশ কাটবে তাদের ঐ দিনটি।

শুরু হ'ল দু'জনের দিন গোনা।

কবে আসবে সেই শুভ দিনটি? ছুটির আর কত দেরি?

খবর শুনে সবচেয়ে বুঝি বেশী খুশি হল মিঠুয়া। দেবুদা আর বৌদি পুরী যাবেন শুনে তার সে কি আনন্দ! সে কি আক্ষেপ। নাঃ! সামনেই আবার কলেজের একটা এগজামিন। এগজামিনটা

না থাকলে এই সুযোগে দিব্বি বৌদির সঙ্গে পুরী ঘুরে আসা যেত।

একটি একটি করে দিন কাটে আর একটু একটু করে স্বপ্নসৌধ গড়ে ওঠে। সে কি উৎসাহ! সে কি উদ্দীপনা! চোখে যেন ঘুম নেই দুজনের।

পুরী গিয়ে কোথায় থাকবে। কোন্ হোটেলে। ঘরটি কিন্তু বেশ নিরিবিলি হওয়া চাই।

তাছাড়া শুধু সমুদ্র দেখলেই তো চলবে না। এই সুযোগে একবার কোনারক থেকেও ঘুরে আসতে হবে। এমনি হাজার হাজার কত কথা। কত কল্পনা।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতা ঘুচিয়ে নেমে এল পূর্ণিমার আলোক প্রস্রবণ। অকৃপণ জ্যোৎস্নায় ভরে গেল সাগরের বুক। মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র।

মনীষা চুপ। আকাশের বুকে ফুটে ওঠা তারাগুলোর পানে চেয়ে মনে মনে সে কি ভাবছে কে জানে। তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে ঐ তারাগুলোর মতই।

আবার একসময় মুখর হয়ে ওঠে মনীষা। শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে যেন সে বলতে শুরু করে কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়।

একটা কুলপ্লাবী আনন্দ, একটা বিপুল পরিতৃপ্তি নিয়ে অবশেষে একদিন তারা পুরীতে এসে পা দিল। আশ্রয় নিল সী-বীচের একটা নামকরা হোটেলে।

স্বামীর দুচোখে অনন্ত-বিস্ময়। হোটেলের সামনেই নীল ঊর্মিমুখর সমুদ্র। একটার পর একটা ঢেউ এসে বালুকা বেলায় আছড়ে পড়ছে ছন্দোবদ্ধ গতিতে। দেখে যেন আশা আর মেটে না তার।

আর জয়ন্তী।

আপন প্রেমের সুগন্ধে সে তখন এক চঞ্চলা বনহরিণীর মতই উন্মত্ত যেন। একটা নতুন সুর অনুরণন তুলেছে তার সর্বদেহে, তার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। জীবনে এই সে প্রথম স্বামীকে নিবিড় করে কাছে

পেয়েছে। এ আনন্দ প্রকাশের বুঝি ভাষা নেই তার।

পরিপূর্ণ নিটোল আনন্দে ভরপুর এক-একটা দিন।

দু'জনেই চঞ্চল। বাঁধন হারা।

আজ আর তারা পাঁচিল ঘেরা রক্ষণশীল পরিবারের পুত্র বা পুত্রবধূ নয়। হাজার বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আজ আর তাদের গতিপথ চিহ্নিত নয়।

বাইরের মুক্ত উদার পৃথিবী আজ তাদের চোখে এক অপরিসীম সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে।

আজ তারা স্বাধীন। মুক্ত।

হংস-মিথুনের মত সেই পাশাপাশি ভেসে যাওয়া মুহূর্তগুলো। যৌবনের ভরপুর উদ্দামতায় কখনো সাগর বেলায় ঝিনুক কুড়িয়ে, কখনো ঢেউয়ের দোলায় লুটোপুটি খেয়ে, আবার কখনো বা শুধুমাত্র অথৈ অনন্ত পারাবারহীন নীল জলরাশির পানে তাকিয়ে প্রতিটি মুহূর্তকেই তারা ভরে তুলেছিল বাধা-বন্ধনহীন খুশির জোয়ারে। কোনদিন একটি মুহূর্তকেও বোধ হয় তারা ব্যর্থ হতে দেয়নি।

সেই সব দিন! সেই সব রাত!

আজো সব মনে আছে জয়ন্তীর।

সারাদিনের ক্লান্তির পরে তারা হোটেলের সেই নির্জন কক্ষটিতে গড়ে তুলতো তাদের স্বপ্নবাসর।

চারদিকে নিটোল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। নিচে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ।

কক্ষে শুধু দু'জন। একজন যৌবনোজ্জ্বল পুরুষ, আর একজন কামনা-ব্যাকুলা নারী। আর একজনের প্রয়োজনের তাগিদে নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলিয়ে দেবার মধ্যে যে এতখানি পরিতৃপ্তি থাকতে পারে, তা আগে বোধ হয় কোনদিনই তাদের কাছে এমন করে ধরা পড়েনি।

তারপর একদিন এল সেই স্মরণীয় প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর রাত্রি।

পূর্ণতার ঝলমলানিতে সেদিন দু'জনেই ভরপুর।

কত কথা। কত আবেগ। কত অর্থহীন কলগুঞ্জন।

হঠাৎ এক সময় জয়ন্তীকে কাছে টেনে নিয়ে স্বামী বললেন—কই, আজ তো তুমি কিছু চাইলে না আমার কাছে। বলো কি চাও।

কোন কথাই বলতে পারেনি জয়ন্তী। শুধুই আবেগে, আবেশে, বিহ্বলতায়, ভীরু পাখীর মতই সে আশ্রয় নিয়েছিল স্বামীর প্রশস্ত বুকে। কি চাইবে জয়ন্তী? কি চাইবার আছে? কি সে পায়নি?

সংসারে তার সত্যিকারের জায়গাটিকে সে খুঁজে পেয়েছে। আর কিছুই চায় না সে।

স্বামী কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। আজকের দিনে জয়ন্তীকে কিছু না দিতে পারলে উৎসবটাই যেন অপূর্ণ থেকে যায়। ভালোও যেন লাগে না। সুতরাং একই কথার তিনি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন বার বার—বলো কি চাই? কি পেলে তুমি খুশি হও?

স্বামী নাছোড়বান্দা। অগত্যা বাধ্য হয়েই জয়ন্তী বলল—প্রতি-বছর এই দিনটিতে তোমাকে আমি একা পেতে চাই।

—শুধু এই। স্বামী অবাক, আর কিছুই চাও না?

—না। জয়ন্তীর দু'চোখে সকরুণ প্রত্যাশা। গভীর অনুরাগ ও ব্যাকুল নির্ভরতা আর আত্মসমর্পণের নিবিড়তা।

—বেশ তাই হবে। যে ভাবে যে অবস্থায়ই থাকিনে কেন, এ দিনটিতে বরাবর আমরা এখানে চলে আসবো। খুশি হয়েছ?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, এত খুশি আমি কোনদিন হইনি।

আরো যেন কি বলতে চাইল জয়ন্তী, কিন্তু বলা হ'ল না। তার আগেই ঠোঁট দুটি চাপা পড়ে গেল দুটি বলিষ্ঠ ঠোঁটের আড়ালে।

তারপর কত দিন, কত যুগ কেটে গেছে। জয়ন্তী কিন্তু আজো ভোলেনি তার জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ আনন্দময় দিনটির কথা।

ভোলেননি স্বামীও। পুরীর সমুদ্রকে তারা সত্যই ভালোবেসেছিল।

তারপর প্রতি বছর তারা ঐ সময়টাতে পুরী এসেছে। আবার তেমনি করেই তারা উচ্ছল আনন্দে প্রহরগুলোকে ভরে তুলেছে। তবু

প্রথম পাওয়ার আনন্দে সেদিন জয়ন্তী নিজেকে যতখানি মিশিয়ে দিতে পেরেছিল তেমনটি যেন আর কোনবারই হয়নি।

জীবনে প্রথম ভাল লাগার স্মৃতি বুঝি এমনিই হয়। স্মৃতির দিগন্তে অনন্ত সেই পরম লগ্নটিকে বুঝি কোনদিনই ভোলা যায় না।

দিন কয়েক বাদেই আবার সেই কলকাতা। সেই চারদেয়াল ঘেরা চৌধুরীবাড়ী। সেই সংসারের নির্মম রথচক্র।

দিন যায় আবার দিন ফিরে আসে। এমনি করেই দিন মাস বছরের মালা গাঁথা ছন্দে তাদের জীবনেই কেটে গেল পাঁচটি বছর।

পাঁচ বছরে চৌধুরীবাড়ীর পরিবর্তন হয়েছে অনেক।

আজ আর জয়ন্তী শুধু এ বাড়ীর পুত্রবধূই নয়। আজ সে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

পুত্রবধূর হাতে সংসারের যাবতীয় ভার তুলে দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী আস্তে আস্তে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন। সংসারে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তার কোন খবরই আর তাঁরা বড় একটা রাখেন না।

কেনই বা রাখবেন! অমন সতীলক্ষ্মী উপযুক্ত বৌমা থাকতে সংসারের বন্ধনের মধ্যে আর জড়িয়ে থাকা কেন?

এবার যার সংসার সেই বুঝে নিক।

স্বামী চৌধুরী বংশের মুখ রেখেছেন। একদিন কর্মময় জীবনে তিনি যে যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন আজো তা অব্যাহত রয়েছে সমান ভাবেই। এখন তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

শাশুড়ী কিন্তু সে কথা মানতে চান না। স্পষ্টই তিনি বলেন—যা কিছু হয়েছে সবই আমার সতীলক্ষ্মী বৌমার গুণে। আহা, এই না হলে বউ? লক্ষ্মী মেয়ে।

আশ্চর্য, স্বামীও তাই বলেন। কতদিন তিনি জয়ন্তীকে আদর করে কাছে টেনে বলেছেন—শুধু তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে জয়ন্তী। তুমি পাশে না থাকলে কক্ষনো আমি এতটা এগিয়ে যেতে পারতাম না।

জয়ন্তী জবাব দেয় না। শুধু স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে মনে মনে

বলে—তুমি কত বড়। কত মহৎ। আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমার সার্থক জীবন-সঙ্গিনী হতে পারি। তোমার জন্য সব কিছু যেন হাসিমুখে সইতে পারি।

বিশ্বাস করে মিঠুয়াও। বুকটান করেই সে বলে—উন্নতি হবে না মানে!

চালাকি নাকি! এমন নাইস্ বৌদি যেখানে রয়েছে সেখানে দেবুদার উন্নতি না হয়েই পারে না।

মিঠুয়া এখন এম্. এ. পড়ে। স্বভাবের দিক থেকে এখনো সেই আগের মতই সে রয়ে গেছে। এখনো সে সময়ে-অসময়ে এসে নিমেষেই একেবারে বাড়ীটাকে মাথায় করে তোলে।

সবচেয়ে তার বড় আকর্ষণ হল বৌদি। কর্মমুখর ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে বৌদির সঙ্গে গল্পগুজব করে সময়টা তার ভালোই কাটে।

তার নিজের কোন বৌদি নেই। বয়েই গেল। এমন নাইস্ বৌদি থাকতে আবার বৌদির জন্য ভাবনা কি।

দু'জনেই নাইস্। যেমন বৌদি তেমনি দেবুদা!

জয়ন্তী হাসে। হাসিখুশিতে উচ্ছল মিঠুয়াকে তার বরাবরই ভালো লাগে।

অদ্ভুত ছেলে মিঠুয়া। এই পাঁচিল ঘেরা বিরাট চৌধুরী বাড়ীটার অভ্যন্তরে মিঠুয়া শুধু তার দেবরই নয়, সে একাধারে তার দেবর, ভাই, —বন্ধু সবই। মিঠুয়া হাসতে জানে। হাসাতেও জানে।

জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে চারদিক। নির্জন সৈকতে এসে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

তাদের মাথায় ঝক ঝক করছে ফস্‌ফরাসের দীপ্তি।

সহসা চমকে উঠলাম মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে।

সেই সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া আশ্চর্য আর্ত মুখ। কালো দীঘির মত চোখ দুটোতে সেই অসহ্য বেদনার ছায়া।

বেশ বোঝা যায় ওর সারা মনে কোথায় যেন একটা দুরন্ত ঝড় উঠেছে।

মনে হয় যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে ওর কথাগুলো।

সংসারে কোন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সুখের পরেই আসে দুঃখ।

জয়ন্তীর বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। দেখতে দেখতে তার জীবনের আকাশটাও যেন একদিন মেঘে মেঘে ছেয়ে উঠলো।

অথচ স্বামী, সংসার, অর্থ, প্রাচুর্য, সবই তার ছিল। বাঁচতে গেলে যা কিছু প্রয়োজন সবই তার হাতের মুঠোয়।

তবু একটা জায়গায় সে নিদারুণভাবে হেরে গেল। স্বামীকে সে সব কিছু দিতে পেরেছে—শুধু দিতে পারেনি সন্তান। দিতে পারেনি বংশের উত্তরাধিকারী। জয়ন্তী বন্ধ্যা।

নিজের চারপাশে এই বিপুল পরিব্যাপ্ত শূন্যতার আবিষ্কারে মনে মনে ভয় পেয়ে গেল জয়ন্তী।

স্বামী সন্দেহের অতীত। দেহে তার যৌবনের দুর্বার গতিছন্দ। চোখে দিগন্ত সীমার উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। সুতরাং স্বামী সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না।

দোষ তার। নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ চাওয়া-পাওয়ার সংগ্রামে তার শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটেছে।

স্বামী আশ্বাস দেয়। সান্ত্বনা দেয়।

তবু এতটুকু ভরসা পায় না জয়ন্তী। কি করে বোঝাবে যে নিজের দেহ নিংড়ে আর একটা প্রাণসত্তার জন্য তার কি গভীর আকুতি।

শুধু একটি সন্তান। নিজের দেহজাত, নিজের স্নেহ দিয়ে গড়া একটি মাত্র রক্তমাংসের সন্তান।

ঐ অন্তর নিঙড়ানো একটি মাত্র কামনার সার্থক পরিণতির জন্য কত দিন, কত বছর, কত শুক্লা সন্ধ্যা, কত অমানিশা তার ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কেটে গেছে।

কিন্তু বৃথা। বৃথাই তার পথ চাওয়া। মিছেই বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গোনা।

কেউ আসেনি তার কোল জুড়ে। কেউ না।

শ্বশুরের মুখেও দুশ্চিন্তার কালোছায়া। বংশের প্রাসাদের ভিত্তি-মূলে ফাটল ধরেছে। এতদিনের সুগঠিত ভিত টলমল করে উঠেছে। এবার চিরদিনের মতই তা ধসে পড়বে। কেউ থাকবে না চৌধুরী বংশে। কেউ না। এখানেই তার পরিসমাপ্তি।

শাশুড়ীর চোখদুটো মাঝে মাঝেই ছল ছল করে ওঠে। স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—

—কি হবে গো?

—জানিনে। শ্বশুরমশাইয়ের চোখেমুখে বিরক্তির আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একঘেঁয়ে কথা। একঘেঁয়ে অভিযোগ আর ভাল লাগে না শুনতে।

জয়ন্তী সব বোঝে। সব জানে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না। শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে।

কি দুস্তর লজ্জা! তার চেয়েও বড় কথা—এ ব্যাপারে কত অসহায় সে। আজ তার জন্য এ বাড়ীর প্রতিটি লোকের মন থেকে প্রশান্তি মিলিয়ে গেছে। এমনকি ঐ হাসিখুশি মানুষটি পর্যন্ত আজ যেন আগের চেয়ে অনেকটা গম্ভীর হয়ে গেছে। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

নির্মম কালপ্রবাহ স্তব্ধ থাকে না। যত দিন যায় ততই যেন ভেতরে ভেতরে আরো অস্থির হয়ে পড়ে জয়ন্তী।

ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে থাকে তার মনের কোঠায়। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা।

এ বাড়ীর পুত্রবধূ বলে এতকাল মনের মধ্যে একটু একটু করে যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছিল আজ তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

সে বন্ধ্যা। স্বামীর সংসারকে সে ভরে তুলতে পারেনি। এর পর আর সহধর্মিণীর দাবি নিয়ে সে দাঁড়াবে কোন্ মুখে।

ক্রমশ একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়ায় জয়ন্তী। স্বামী তাকে

চরম দুর্গতি ও অপমান থেকে বাঁচিয়েছে। সন্ধান দিয়েছে এক স্বপ্নময় জগতের। প্রয়োজন হলে তার জন্য যে কোনরকম ক্ষয়ক্ষতিকে সে মেনে নেবে। তবু তাকে সে এমন করে ব্যর্থ হতে দেবে না।

কথাটা শুনে স্বামী হেসেই খুন। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন —আবার বিয়ে! আবার বিয়ে করতে হলে তার জন্যে তোমাকে কি মূল্য দিতে হবে জানো? পারবে চিরদিনের জন্য আমাকে ছেড়ে থাকতে!

—না, না। ভয়ে আতঙ্কে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ওঠে জয়ন্তী।

স্বামী তার সর্বস্ব। তার ভাবনা-চিন্তা। দেহ মন সবকিছু সে উজাড় করে দিয়েছে স্বামীকে। কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। আজ সে নিঃস্ব, রিক্ত, কাঙাল।

কি করে সে স্বামীকে ছেড়ে থাকবে! তার প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়া এই সংসারকে কি করে সে অন্যের হাতে তুলে দেবে!

—এত ভাবনার কি আছে! সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী বললেন— এখনো এতটা হতাশ হবার মত কোন কারণ ঘটেনি।

কিন্তু, আর কোন কথা খুঁজে পায় না জয়ন্তী। শুধু একটা বিষন্ন করুণ ছায়া ঘনিয়ে আসে তার কালো চোখের তারায়।

—উঁহুঁ, আর কোন কিন্তু নয়। প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য স্বামী বললেন—এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়। বেশতো, আরো মাস ছয়েক যাক তারপর তোমার কথাটা না হয় ভেবে দেখা যাবে। নাও, হলো তো। যতো বাজে ভাবনা আর মিছিমিছি চোখের জল ফেলা।

তবু ভরসা পায় না জয়ন্তী। পায় না আশ্বাস। নিজেকে সে ভালো করেই জানে। ছ'মাসে কেন, ছ'বছর অপেক্ষা করলেও তার শূন্য বুকটা আর কোনদিনই ভরে উঠবে না।

সে বন্ধ্যা। সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু হাহাকার আর নীরবে অশ্রু মোচন করা ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই তার।

দেখতে দেখতে যেন একটা বেমানান নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায় জয়ন্তী। কেউ তার মনের হদিস পায় না।

মুখ বুজে সংসারের প্রতিটি কাজ করে যায় ঠিকই—কিন্তু মনটা যেন সব সময় ঠিক দেহের মধ্যে থাকে না। যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে সে।

শাশুড়ী সব বোঝেন। কাছে এসে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন —কি হয়েছে বৌমা?

জয়ন্তী কোন জবাব দিতে পারে না। শুধু ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে অল্প অল্প।

—বলো কি হয়েছে? আমি মা। আমার কাছে বলতে লজ্জা কি? খোকার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

জয়ন্তী মাথা নাড়ে। কিছুই বলতে পারে না।

—তবে? শাশুড়ীর দুচোখে নিবিড় শঙ্কা।

—আপনারা ওর আবার বিয়ে দিন মা।—কথা বলেই শাশুড়ীর বুকে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ে জয়ন্তী।

আজ সে পরাজিত। অন্তরের কোন সম্পদই আর তার পুঁজি নেই—যা দিয়ে এ সংসারটাকে সে ফুলে ফলে ভরে তুলতে পারে। কিসের জোরে আজ সে নিজের জায়গা দখল করে রাখবে। কোন্ যুক্তিতে?

চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে শাশুড়ীর। তাঁর কত আদরের বৌমা। বৌমার স্নিগ্ধ সুন্দর চোখ দুটিতে তিনি দেখেছেন আকাশের বিস্তার। দেখেছেন কল্যাণী বধূর স্নেহ মমতা ভরা সংসারের স্বপ্ন। আজ তার চোখে কিনা এই বাঁধনহারা অশ্রু। দেখে বুকটা যে ফেটে যেতে চায়।

স্ত্রীর মুখে কথাটা শুনে গুম্ হয়ে বসে রইলেন শ্বশুরমশাই। বৌমার জন্য তাঁর স্নেহটা কারো চাইতে কম নয়, বরং বৌমার মধ্যে চৌধুরী-বাড়ীর উপযুক্ত পুত্রবধূকে খুঁজে পেয়ে মনে মনে বেশ একটু খুশিই তিনি হয়েছিলেন।

আজ তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। বৌমার জন্য দুঃখ হলেও আজ তিনি নিরুপায়।

সংসারটা অতি কঠোর। শিশুসুলভ ভাবালুতায় ভেঙ্গে পড়লে সংসার চলে না।

জয়ন্তী সবই বোঝে। তবু কারো বিরুদ্ধেই তার কোন অভিযোগ নেই। দোষ দেয় না সে কাউকেই। শুধু দুঃখ হয়।

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু পেতে হয়। এই তো সংসারের নিয়ম।

এ বাড়ীতে সবার কাছে সে যতখানি স্নেহের পাত্রীই হোক না কেন, তার এই ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ কেউ দেবে না। কেউ দেবে না তার মূল্য।

তবু মনে মনে আশ্বস্ত হতে পারে না জয়ন্তী। ভয় স্বামীকে। স্বামীকে সে জানে। তার অন্তহীন ভালোবাসার প্রমাণও সে পেয়েছে। এ ব্যবস্থায় যদি সে রাজী না হয়!

যদি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে?

যদি রুখে দাঁড়ায়?

মনকে শক্ত করে জয়ন্তী। স্বামীকে যে করে হোক রাজী করাতেই হবে। তিনি বুদ্ধিমান। বিবেচক।

আরও দু'মাস কেটে গেছে। কোন দিক্ থেকেই এতটুকু আশার আলো দেখা যায়নি। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আজ সে ক্লান্ত, পরাজিত, বিপর্যস্ত।

যুক্তিটাকে নিশ্চয়ই তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

দরকার হলে তার জন্য চিরদিনের মতই সে সরে দাঁড়াবে।

আশাবাদী পিতার স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে মাস দুয়েক আগে একটা স্কুলে সত্যসত্যই তাঁর কাজ জুটেছে।

বাকি জীবনটা তাঁর কাছে গিয়েই সে কাটিয়ে দেবে। তবু জেনে-

শুনে স্বার্থপরের মত স্বামীকে ধরে রেখে তাকে কোন রকমেই ব্যর্থ হতে দেবে না সে।

দিন যায়। দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা ক্লান্তিকর অবসাদ দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে জয়ন্তীর।

কোন কাজে মন বসে না। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। পালাতে ইচ্ছা করে এই পরিবেশ থেকে।

কত কি মনে পড়ে। মনে পড়ে পুরনো জীবনের ছন্দ। পুরনো মানুষের কথা।

মনে পড়ে বান্ধবী অনুপমার কথা। বছর তিনেক আগে অনুপমার বিয়ে হয়ে গেছে। চিঠি এসেছিল, কিন্তু সংসার ফেলে যেতে তার মন সরেনি।

দীর্ঘদিন পরে অনুপমা স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয় ফিরে এসেছে। গতকাল তার চিঠি এসেছে। জয়ন্তীকে সে দেখতে চায়।

হঠাৎ ভাবনাটা যেন অন্যদিকে মোড় নেয়। গেলে কেমন হয়! কতদিন বাবার কাছে যাওয়া হয়নি। ছ'দিনের জন্য ঘুরে এলে কেমন হয়। শাশুড়ী খুশি মনেই মত দিলেন। সেই ভালো। বৌমার মনটা ভালো নেই। ছ'দিনের জন্য ঘুরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দীর্ঘ-দিন পর জয়ন্তীকে পেয়ে অনুপমার সে কি আনন্দ! কত পুরনো কথা। কত আবেগ। কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না।

জয়ন্তীর মনে তখন অন্য লোকের স্বপ্ন। অনুপমার শিশু সন্তানটিকে বুকে নিয়ে কেমন যেন একটা নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে তার।

এমনি একটি সুন্দর ফুটফুটে সন্তান তার কোল জুড়েও আসতে পারতো! কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সব। এ জীবনে তার শূন্য মুঠি কোন দিনই ভরবে না।

অনুপমার ছ'চোখে বিস্ময়। কি ব্যাপার!

এতক্ষণ সে একটানা কথা বলেছে, কিন্তু জয়ন্তীর দিক থেকে তো

তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

কি হয়েছে ওর? সারা মুখ ম্লান, বিষণ্ণ। ঠোঁট দুটি শুকনো। চোখের প্রান্ত ভেজা ভেজা। কি হল?

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না জয়ন্তী। বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই সে কেঁদে ওঠে ছোট্ট মেয়েটির মতো।

সে বন্ধ্যা। মা হবার যোগ্যতা তার নেই। এ দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই তার।

দেখতে দেখতেই অনুপমার চোখদুটি জলে ভিজে ওঠে। ঐশ্বর্যময়ী বান্ধবী যে ভেতরে ভেতরে এত রিক্ত, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে পড়ে অনুপমার। পাশের ঘর থেকে স্বামীকে ডেকে এনে সে বলে—হ্যাঁগো, তুমি তো একজন নামকরা গাইনোকলোজিস্ট। দ্যাখনা গো ওর কি হয়েছে?

লজ্জায়, কুণ্ঠায় ঘেমে ওঠে জয়ন্তী। এমন একটা পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে।

তবে অনুপমার স্বামীটি সত্যই ভদ্র। রুচিবোধও তার প্রশংসনীয়।

যথারীতি পরীক্ষা করে তিনি যা বললেন, তাতে দেহের সমস্ত রক্ত নিমেষেই বুঝি মাথায় উঠে গেল জয়ন্তীর।

অনুপমার জিজ্ঞাসার উত্তরে স্পষ্ট অথচ দৃঢ়কণ্ঠে একটিমাত্র কথাই তিনি বললেন বারবার—কে বলেছে এসব বাজে কথা। সি ইজ কোয়াইট নর্মাল।

সেদিন সারারাত ঘুমোতেই পারেনি জয়ন্তী। কানের কাছে কেবলি বেজে চলেছে একটি মাত্র কথা—সি ইজ কোয়াইট নর্মাল।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। তবু ঘুম আসে না। চোখ দুটিতে অসহ্য জ্বালা। মনেও জ্বালা।

এ কি অদ্ভুত কথা। এ যে ভাবতেই পারেনি সে।

অথচ এতকাল ভুল বুঝে অন্তর্দ্বন্দ্বে নিজেকে কি ক্ষত-বিক্ষতই না সে করেছে। কত না ধিক্কার দিয়েছে নিজের মন্দ ভাগ্যকে।

আজ একটা প্রবল বর্ষণে সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সহসা ভাবনার গতি পাল্টায়। শীতল সরিস্বপের মতো মনের মধ্যে উঁকি দেয় অন্য একটা অবাঞ্ছিত চিন্তা।

তাহলে সত্যিকার ত্রুটিটা কোথায়?

কার অক্ষমতা? স্বামীর?

নিশ্চয় তাই। তাছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

কিন্তু এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত! অমন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ভাবাই যেন যায় না।

অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একটা সন্দেহের তিল মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল বারবার। কিন্তু সংশয় শেষ পর্যন্ত সংশয়ই রয়ে গেছে। রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি।

কিন্তু আজ আর কোন ভুল নেই। অনুপমার স্বামী আজ তার সমস্ত সংশয় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এখন কি করতে পারে জয়ন্তী। স্বামীকে সব খুলে বলবে?

না না, অসম্ভব। স্বামীর পৌরুষকে সে ধিক্কৃত করতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না তাকে ছোট করতে।

এ কারো ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। অথচ জানতে পারলে সে দুঃখ পাবে। আহত হবে।

চিরদিনের মত মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলবে।

না না, জেনেশুনে স্বামীকে সে কিছুতেই এতবড় সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারবে না।

তাহলে উপায়? সারারাত বিনিদ্র শয্যায় অর্ধচেতন জড়তার মধ্য দিয়ে কত কি এলোমেলো ভাবনার স্তূপ সামনে এসে দাঁড়ায়—তবু কোন উপায় খুঁজে পায় না জয়ন্তী। শুধুই চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

জীবনের পাশাখেলায় চরম ব্যর্থতার সঙ্গে স্বামী হেরে গেছে।

হেরে গেছে সে নিজেও। সে বন্ধ্যা, এই চরম মিথ্যাটাকেই

তাকে জোর করে সবার মনে জিইয়ে রাখতে হবে আজীবন।

এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি। দিগন্তবিস্তৃত নির্জন নিরালা সমুদ্র সৈকতে বসে আছে মাত্র দুটি প্রাণী।

এক অনন্ত রহস্যময়ী নারী, আর এক মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষ। তাছাড় জনমানবের কোন চিহ্নও নেই।

কতক্ষণ কেটে গেছে হিসেব করিনি। তার ইচ্ছেও হয়নি কারণ মনীষা এখনো মুখর।

মনের মধ্যে তার জমাট বেঁধে আছে অনেক কথা, অনেক আবেগ।

আজ সে তার সমস্ত আবেগ ঢেলে দিতে চায়। উজাড় করে দিঃ শূন্য হতে চায়।

দু'দিন বাদেই জয়ন্তী আবার স্বামীর ঘরে ফিরে গেল। ফিে গেল মনের উপর এক জগদ্দল পাথর চাপিয়ে।

কিন্তু কোথায় সেই জয়ন্তী।

সেই দৃষ্টি, সেই যৌবন-চাঞ্চল্য আজ স্তিমিত।

এ যেন তার ছায়া মাত্র। আগেকার মত কাজকর্ম করতে চেষ্ট করে ঠিকই, কিন্তু মনে হয় কাজ করছে শুধু তার হাত-পাগুলো মনটা যেন তার আয়ত্তের বাইরে।

মাঝে মাঝে কাজেও কেমন যেন ভুল হয়ে যায়। পরে ভুল বুঝতে পেরে নিজেই আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন আর সংশোধন করবার উপায় থাকে না।

মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহেও যেন একটু ভাঙ্গন ধরেছে। কেমন যে হাঁপিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। কথা বলতেও ভাল লাগে না, ইচ্ছেও করে না।

কি যেন ভাবে দিনরাত। কিন্তু কোন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

হাত-পা বাঁধা এক অসহায় দুঃখের গুরুভার যেন একটা জগদ্দল পাথরের মত তার বুকে চেপে বসেছে।

শাশুড়ীর নজর এড়ায় না। দু'চোখে তার নিবিড় সংশয়।

কোথায় সেই চঞ্চল হাসিখুশি-ভরা বৌমা। বৌমার মুখখানি যেন বাসি রজনীগন্ধার মালা।

প্রতি পদক্ষেপে তার পরাজয়ের গ্লানি। দুঃখ ও বেদনার ভারে সে যেন একেবারেই মুষড়ে পড়েছে।

—বৌমা! পায়ে পায়ে শাশুড়ী এগিয়ে আসেন।

ডাক শুনে মুখ তুলে তাকায় জয়ন্তী। দীর্ঘ আয়ত চোখে ক্লান্তিময় চাহনি। বেদনার পাণ্ডুর আভা। হতাশায় ভরা।

—কি হয়েছে বৌমা? শাশুড়ীর ব্যাকুল প্রশ্ন।

—কিছু হয়নি তো মা।—বুক জুড়ে কম্পন শুরু হয় জয়ন্তীর। তবু জোর করে মুখে হাসি ফোটায়।

—তুমি অমন করে থেক না বৌমা! আমার যে দেখে বুকটা ফেটে যায়।

সব দৈন্য, সব ব্যর্থতা বুঝি ঐ মৌন দরদী দৃষ্টির সামনে ফেটে পড়তে চায় জয়ন্তীর। সঙ্গে সঙ্গেই সে পালিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে। আজ সবার দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া অন্য কোন গতি নেই তার।

পালিয়েও রেহাই পায় না জয়ন্তী। মিঠুয়ার মুখেও ঐ একই প্রশ্ন —বৌদি যেন আর সেই বৌদি নেই!

সেই রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে, স্নিগ্ধতা আছে, নেই শুধু সেই প্রশান্তি।

কেন এমন হল?

—কি হয়েছে বৌদি? মিঠুয়ার সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—কিছু হয়নি তো! বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাটা চেপে কোন রকমে জবাব দেয় জয়ন্তী।

—তাহলে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কৌতূহল, বিস্ময় ও আরো অনেক কিছুর সংমিশ্রণে এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চোখের দৃষ্টিটা প্রখর হয়ে ওঠে মিঠুয়ার—

—বলনা বৌদি কি হয়েছে, লক্ষ্মীটি!

—বলছি তো কিছু হয়নি। জয়ন্তীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—হয়নি!······সহসা চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে মিঠুয়ার।

দীর্ঘকালের নিবিড় পরিচয়ের ফলে বৌদির উপর তার মায়া পড়ে গেছে। বৌদির এমন কী দুঃখ থাকতে পারে, যা নাকি মিঠুয়াকে বলা যায় না।

ত্রস্তে সরে যায় জয়ন্তী। কেমন যেন কান্না পায় তার।

মিঠুয়া তার দেবর—ভাই বন্ধু সবই। অবুঝ ছেলেটার এই ব্যাকুল প্রশ্নের আজ সে কি জবাব দেবে!

কি করে ওর চোখের সামনে তুলে ধরবে নিজের দাম্পত্য-জীবনের বিবর্ণ ছবিটাকে।

ও হয়তো শুনে দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। এই চরম লজ্জার কথা সংসারের কাউকেই বলা চলবে না। এ দুঃসহ বোঝা একাই তাকে বইতে হবে নীরবে।

স্বামীর দুচোখেও ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। কি হয়েছে জয়ন্তীর?

এই কদিনের মধ্যেই ও যেন বদলে গেছে। প্রায় চুপচাপই থাকে। মনে মনে কি যেন ভাবে।

কেউ ডাকলেও যেন সাড়া দিতে ভুলে যায়। আবার নিজেই হয়তো একসময়ে চমকে ওঠে।

এ যেন আগেকার সেই জয়ন্তী নয়। যে মধুর সম্পর্কটুকু তাদের দুজনকে ঘিরে একটি স্বপ্নময় জগৎ গড়ে তুলেছিল, আজ তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

দিনের বেলার জয়ন্তী এড়িয়ে যায়। এড়াতে পারে না রাত্রে।

হাজার ব্যাকুল প্রশ্ন তখন ঝরে পড়ে স্বামীর কণ্ঠে। কি ব্যাপার

কেন জয়ন্তীর এই নিঃশব্দ নীরবতা ?

কিন্তু সব বৃথা। স্বামীর মমতা আজ, আর জয়ন্তীকে এতটুকু বিচলিত করে না, সাড়া জাগায় না। দেহ মনেও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে না।

এ সহানুভূতি আজ তার কাছে নিতান্তই অর্থহীন। ভালও লাগে না।

স্বামীর উচ্ছ্বাস তবুও থামে না। অত্যন্ত নিবিড় বাঁধনে কাছে টেনে নিয়ে একটানা কত কি বলে যান তিনি। কত সান্ত্বনা, কত ভালোবাসার কথা, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। আরও কত কি !

তবু কোন জবাব দেয় না জয়ন্তী। রাগ নয়, আক্রোশ নয়, অভিমানও নয়। শুধু বুক জুড়ে এক বিরাট শূন্যতা।

নারীর অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা শুধু দেহের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। দেহকে ছাপিয়ে সে সন্ধান দেয় দেহাতীতের।

যে নিষ্ঠায়, যে পরিপূর্ণতায় সে প্রাণের দেবতাকে অঞ্জলিভরা পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করছিল, তার সব কিছুই আজ পরিণত হয়েছে ব্যর্থ লজ্জায়।

কেউ পারবে না আজ তার রক্তের গাঙে ঢেউ তুলে তার নোঙরহীন তরীকে কূলে পৌঁছে দিতে।

সব বৃথা, সব অর্থহীন। সব মিথ্যা হয়ে গেছে।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। ক্ষীণ একটা সন্দেহের ঝিলিক। তারপরই জয়ন্তীর আনত মুখখানি তুলে ধরে গভীর আবেগে স্বামী বলে ওঠেন—আমার দিকে তাকাও জয়ন্তী। বল কি হয়েছে। কেন তুমি সব সময় এমন দূরে সরে থাক। আমার যে বড় দুঃখ হয় !

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে ঝরঝর করে।

ভগবান জানেন স্বামীকে সে কোনদিনই দুঃখ দিতে চায় না। দিনে দিনে দু'জনে দু'জনের উপর যে আস্থা আর বিশ্বাস গ'ড়ে তুলেছে

তা চিরদিনই সে বজায় রাখতে চায়।

তবু কেন যে এমন হল, এ প্রশ্নের কোনই জবাব খুঁজে পায় না সে। শুধু চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

রাত বাড়ে। স্বামী এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমোতে পারে না জয়ন্তী। কিসের যেন একটা ব্যথা প্রতিবাদের রূপ ধরে কেবলি গুমরে মরে বুকের মধ্যে।

কেন এমন হল ?

কি তার অপরাধ ? কেন পৃথিবীর আলো-বাতাস, আনন্দ ও সান্ত্বনা থেকে এভাবে বঞ্চিত হতে হল !

কেন তার জীবনটা বান্ধবী অনুপমার মত সুধায় ভরে উঠল না ! কেন ! কেন ! কেন !

জোয়ারের জলে সমুদ্রটা যেন আরো অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউ এসে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। রাশি রাশি ফেনা ছড়িয়ে আবার পরক্ষণেই উৎক্ষিপ্ত জলরাশি নেমে যাচ্ছে অনেকটা নিচে।

মনীষা নির্বাক। ঢেউয়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছে, সে খেয়ালও যেন তার নেই। একটু থেমে আবার সে বলতে শুরু করে কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়গুলো।

তবু মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল জয়ন্তী। ভেবেছিল, কি লাভ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিমান করে !

যা কোনদিন বাস্তবে রূপ পাবে না ; যা কোনদিনই সত্য হয়ে উঠবে না, তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তার চেয়ে এই বা মন্দ কি !

নাই বা ভরলো তার শূন্য বুক, তবু স্বামী তো আছেন। তার ছায়ায় বসেই সে জীবনের বাকি দিনগুলো সুখে দুঃখে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তাই নির্জন ঘরে শুয়ে রাতের সেই কল্পনা দিনের আলোর রূঢ় আঘাতে মিলিয়ে যেতে বিলম্ব হল না।

পরিস্থিতি জটিল করে তুললেন শ্বশুর মশাই।

অবশ্য এ জন্য তাঁকে এতটুকুও দোষ দেওয়া চলে না। তিনি বেঁচে থাকতে চৌধুরী বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে—এত বড় ক্ষতিটাকে তিনি সইবেন কি করে! এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

বৌমার ছেলেপুলে হলে কোন কথাই ছিল না। তা যখন হলই না, তখন এত কষ্টের বিষয়সম্পত্তি পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে ; তা কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব!

একমাত্র উপায় ছেলের আবার বিয়ে দেওয়া। অবশ্য বৌমার জন্য কোন ভাবনা নেই। বাকি জীবনটা সে যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করবেন।

স্বামী সব দিক থেকেই আদর্শ। পিতামাতার বিরুদ্ধে মুখ তুলে কথা বলবার মত কুশিক্ষা তিনি কোনদিনই পাননি। তবু এক্ষেত্রে পিতার নির্দেশটাকে তিনি ঠিক মেনে নিতে পারলেন না।

তা হয় না! জয়ন্তীর কি দোষ!

অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য জয়ন্তীকে তিনি এত বড় শাস্তি দেবেন কি করে?

শ্বশুর মশাই রাশভারী লোক। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতিকে কেউ কোনদিক থেকে বাধা দিক—তা কোনদিনই তিনি চান না।

সহ্যও করতে পারেন না। এমন কি নিজের ছেলে হলেও না।

বলা বাহুল্য, সে জবাব শুনে তাঁর রক্ষণশীল নীলরক্ত উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে দেরি হল না। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে অবশেষে তিনি রায় দিলেন—তাহলে তোমরাই এ বাড়ীতে থাকো। আমি বরং তোমার মাকে নিয়ে কাশী চলে যাই।

স্বামী নিঃশব্দে মাথা নিচু করে রইলেন। সারা মুখ তার শ্রাবণের মেঘের মতই থমথমে।

বেশ বোঝা গেল যে নিজের সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল। অন্যান্য ব্যাপারে পিতামাতার আদেশ মাথা পেতে নিলেও এ ব্যাপারে তিনি অক্ষম।

আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সারা দেহ যেন অসাড় হয়ে এল জয়ন্তীর। সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ভেঙে পড়ল বিছানায়।

এ যে আগামী ঝড়ের পূর্বাভাষ। এবার পিতাপুত্রে বিরোধ অনিবার্য!

কি করে সেই চরম দুর্যোগ সে ঠেকাবে?

কি করে স্বামীকে বাঁচাবে তার সর্বনেশে পরিণাম থেকে?

না না, আর এখানে নয়।

আজ তাকে নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। এখানে থাকা মানেই সে বিরোধের প্রশ্রয় দেওয়া। তার চেয়ে চিরদিনের মতই সে দূরে সরে যাবে।

হয়তো বুকটা ব্যথায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। দুঃসহ মনে হবে।

হোক। তবু এখানে থেকে স্বামীর এত বড় সর্বনাশ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

পিতার আদেশ মত স্বামী আবার বিয়ে করে সুখী হোক। তার সংসার আবার নতুন করে ফুলে ফলে ভরে উঠুক।

সহসা কি একটা কথা মনে হতেই দেহের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে আসে জয়ন্তীর।

কি সর্বনাশ! এ যে অসম্ভব।

স্বামীর সংসার যে কোনদিনই ফুলে ফলে ভরে উঠবে না। সে আশাও যে সুদূর পরাহত! বরং তার ফলে প্রশ্ন আরো জটিল হয়ে উঠবে।

জয়ন্তী মরবে। শ্বশুর-শাশুড়ী মরবে। মরবে আর একটি অসহায় প্রাণী।

তাকেও তিল তিল করে এমনি ভাবেই ব্যর্থ হতে হবে। তারপর একদিন হয়তো জয়ন্তীর মতই মিথ্যে অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে চিরদিনের মত সরে যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে সারামুখে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে জয়ন্তীর।

না, স্বামীকে সে কিছুতেই এত বড় ভুল করতে দেবে না। কোন মতেই না।

সে স্বামীর সহধর্মিণী। শুধু সেবাযত্ন বা ভালোবাসাই নয়, যোগ্য সহচরীর মত তার প্রতিটি ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়াও তার কর্তব্য।

যে করে হোক, স্বামীকে ঐ আসন্ন দুর্যোগের পরিণতি থেকে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখবে সে। শিশুসম সরল মানুষটি যে তার উপরই একান্তনির্ভর। জেনেশুনেও এর পরে সে চুপ করে থাকবে কি করে ?

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব !

সহসা ভাবনার গতি পালটায়। স্বামীকে সে বাধা দেবে কি করে ! কোন্ যুক্তিতে !

কি করে সে বলবে যে এ সম্ভব নয়, কোন ওদিনই সে পারবে না সন্তানের পিতা হতে !

অসম্ভব। কিছুতেই সে পারবে না তাকে পাঁচজনের মধ্যে ছোট করতে।

তাহলে উপায় !

একে একে অনেক প্রশ্নের জটলা এসে ভীড় করে জয়ন্তীর মনে। এলোমেলো আবোল-তাবোল সব ভাবনা।

এই ঘর, এই সংসার তার কত প্রিয়। তার ভাবনা-চিন্তা, দেহ-মন—সব কিছুই যে বিলিয়ে দিয়েছে এই সংসারের জন্য। দেবার মত আর কোন কিছুই সে বাকী রাখেনি।

আজ এই পরিস্থিতিতে এখন তার কি করা কর্তব্য !

স্বামী মহানুভব। সে তাকে চরম দুর্গতি ও অপমান থেকে বাঁচিয়েছে।

বিনিময়ে তাকে কতটুকু সে দিতে পেরেছে!

স্বামীর উপকারটুকু অঞ্জলি পেতে নেবে, পরিবর্তে কিছুই কি সে দেবে না!

কিন্তু কি আর তার দেবার আছে? সবকিছু উজাড় করে দিয়ে সে যে একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে।

ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ।

এমন মর্মান্তিক ভাবনা বুঝি কোনদিনই ভাবেনি জয়ন্তী। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব যেন ক্রমশই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক ভয়াবহ নির্মম পরিণতির দিকে।

বংশধর। একমাত্র বংশধরই পারে আজ এই অনিবার্য দুর্যোগকে নিমেষে কাটিয়ে উঠতে।

কিন্তু কোথায় পাবে সে বংশধর! যে ঐশ্বর্যের জোরে বান্ধবী অনুপমা আজ সংসারকে সুধায় ভরে তুলেছে, সে সম্বল তার কোথায়!

অনুপমা মা। সে সামান্য এক নারী।

ব্যথা-দুঃশ্চিন্তায় ক্রমশ যেন পাগল হয়ে ওঠে জয়ন্তী।

অসহ্য লাগে। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে। সাংঘাতিক একটা কিছু করবার ইচ্ছা জাগে।

তারপরই সব স্থির। না, কোন উপায় নেই!

সব তলিয়ে যাবে। সব ভেঙে তচনচ হয়ে যাবে। নিজের হাতে গড়া এই সংসার তাসের ঘরের মতই লুটিয়ে পড়বে। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণাম থেকে কারো এবার রেহাই নেই।

সহসা এক নিদারুণ যন্ত্রণানুভূতিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ে জয়ন্তী।

সংসারে আজ আর অন্যকিছুই সে চায় না। শুধু চায় নিজের দেহজাত স্নেহ মমতা দিয়ে গড়া একটি রক্তমাংসের সন্তান।

ছোট্ট আশা, কিন্তু সে আশাও আজ তার পূর্ণ হবার নয়।

পাঁচিলের ও-পাশেই মিঠুয়ার ঘর। জানালা দিয়ে সব কিছুই দেখা যায়।

বৌদিকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে নিমেষেই মনে মমতার একটা ব্যাকুল সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে মিঠুয়ার।

কি ব্যাপার! কেন বৌদি এমন করে ভেঙে পড়লেন বুকভাঙা বেদনায়! কিসের ব্যথায়!

সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচিলের খোলা দরজা দিয়ে এ বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় মিঠুয়া।

সম্প্রতি তার এম. এ. পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে দিল্লীতে পিসিমার কাছে বেড়াতে যাবে—এমনি একটা ব্যবস্থা আপাতত ঠিক হয়ে আছে।

—কি হয়েছে বৌদি! পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে মিঠুয়া।

জয়ন্তী জবাব দেয় না। দিতে পারে না।

অমন করে কেঁদো না বৌদি। চোখ দুটিতে এক অব্যক্ত আকুতি ঘনিয়ে ওঠে মিঠুয়ার।

কে জবাব দেবে! স্নেহ তরঙ্গায়িত স্পর্শে আরো যেন বেশী করে ভেঙে পড়ে জয়ন্তী!

—তোমার পায়ে পড়ি বৌদি,—চুপ করো। তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমার যে বড় দুঃখ হয়। বলো, কি হয়েছে! লক্ষ্মীটি, বলো আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে জয়ন্তী। মনে মনে এতক্ষণ সে একটা মানুষ খুঁজছিল—যার কাছে সে একটু ভেঙ্গে পড়তে পারে। চোখের জল ফেলে বুকের বোঝাটাকে একটু হালকা করতে পারে।

এতক্ষণে সেই মানুষটিকে,—সংসারে তার সেই সবচেয়ে স্নেহের পাত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ওর কাছে কি করে সে নিজের এই দুঃসহ ব্যথাটাকে ব্যক্ত করবে!

ও যে কত ছোট। কত স্নেহের। না! না, ওকে বলা সম্ভব নয়!

—একবার মুখ তুলে তাকাও বৌদি। লক্ষ্মীটি! মিঠুয়ার কান্না ভেজানো-স্বর ঝরে পড়ে।

তবু মুখ তুলতে পারে না জয়ন্তী। মুখ তুললেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে সে।

আশ্চর্য! কোথায় মিঠুয়ার সেই মুখভরা হাসি। কোথায় সেই দুষ্টুমিভরা চোখ!

বৌদির কান্নায় ভেঙে পড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে বুকটা যেন তার হাহাকার করে ওঠে নিদারুণ এক শূন্যতায়।

বৌদি বন্ধ্যা। বাড়ীতে মায়ের কাছেই সে এ খবর শুনেছে। বেশ বোঝা যায় নারী জীবনের এই চরম ব্যর্থতাই ঐশ্বর্যময়ী অথচ অসহায় বৌদিকে আজ এভাবে হতাশ ও বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে চারদিক। ভেসে গেছি আমরাও।

মনীষা তার মনের তরী খুলে দিয়েছে। কোথায় কোন্ কূলে গিয়ে সে ভিড়বে কে জানে।

আপাতত মনীষা চুপ। মনে মনে কি যেন ভাবছে সে। রাত্রির এই নিঃসীম মুহূর্তে তার স্মৃতির পাথারে কিসের যেন একটা ঢেউ উঠেছে।

একটু বাদেই আবার মনীষা মুখর হয়ে ওঠে।

জয়ন্তীর জীবন সংগ্রামে সহসা যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। সেই ঝড়ে তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, ভবিষ্যৎ, চিরদিনের মতই কোথায় তলিয়ে গেল।

শুধু পড়ে রইল একটা বিরাট শূন্যতা, চাপা আর্তনাদ, আর বুক-ফাটা হাহাকার।

স্বামীর মনে শান্তি ছিল না। জয়ন্তীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে। কিন্তু ইদানীং তার মনের কোন নাগালই তিনি পান না।

চেষ্টা করেছেন অনেক। কিন্তু রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি।

হঠাৎ জয়ন্তীর মুখে ছোট্ট একটু আব্দার শুনে মনে মনে বেশ একটু বিস্মিতই হলেন তিনি। জয়ন্তী নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়ে বললে—আজ সিনেমায় যাবে!

--সিনেমা! আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলেন স্বামী, সিনেমায় যাবে তুমি! বেশতো, আজই চলো। তুমি রেডি থেকো। আমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই অফিস থেকে ফিরে আসবো। বরং টিকেটটা একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবো।

—না, ও সময়ে নয়! মৃদু আপত্তি জানায় জয়ন্তী,—সবার খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নাইট শো'তেই যাবো।

—বেশ তাই হবে। আমি টিকেট কিনে রাখবো।

স্বামী এক কথায় রাজী। আজ কতদিন পরে জয়ন্তী মুখ ফুটে একটা আব্দার জানিয়েছে। এ আনন্দ প্রকাশের বুঝি ভাষা নেই তার।

যথাকালে কিন্তু স্বামীর এই উচ্ছ্বাস আর রইল না। জয়ন্তী তখন শয্যাশায়ী। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। এ অবস্থায় কোন রকমেই যাওয়া সম্ভব নয়।

বাধ্য হয়েই স্বামী চলে গেলেন একা।

অবশ্য এ অবস্থায় তিনি যেতে চাননি, কিন্তু জয়ন্তীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে যেতেই হলো।

যুক্তিও ছিল অকাট্য! তার এই সামান্য অসুস্থতার জন্য স্বামীর ছবি দেখা বন্ধ হবে কেন! তাছাড়া মিছিমিছি টাকাগুলো নষ্ট করে লাভ কি!

তার চাইতে স্বামী একাই বরং চলে যাক। তারপর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটা টিকেট বিক্রি করে দিলেই চলবে।

স্বামী চলে যাবার পরে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে জয়ন্তী।

ঠিক ঘুমের জড়তা নয়, তন্দ্রালস্যও নয়, তবু সে চোখ বুজে পড়ে থাকে চুপচাপ।

রাত গড়িয়ে চলে। দেখতে দেখতে গোটা বাড়ীটা তলিয়ে যায় ঘুমের অতলান্তে।

শুধু ঘুম নেই জয়ন্তীর চোখে। সেই ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী একটা অনুভূতিহীন আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই ভারী সুন্দর একটা স্বপ্ন নেমে আসে তার চোখের পাতায়।

দূরে কোন স্বপ্নলোকে রয়েছে কামনা বিহ্বল পুরুষ ও প্রকৃতি। নিজেকে তারা হারিয়ে ফেলেছে কোন এক মহাসৃষ্টির আনন্দে।

সুনিবিড় মাধুর্য রসে উভয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। হৃদয়ের ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে নীরব সুগভীর তৃপ্তিতে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশা ধরে যায় জয়ন্তীর।

মিলনের কি মধুর পরিবেশ। কি নিশ্চিন্ত অবসর।

সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত, নিঃশব্দ।

শুধু ঐ পুরুষ আর প্রকৃতি তন্ময় হয়ে ডুবে রয়েছে সময়হীন, হিসেবহীন এক অপরিসীম আনন্দের মধ্যে।

এই তো প্রকৃত জীবন। এই তো জাগ্রত যৌবনের দীপ্ত অভিযান।

সহসা এক নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে জয়ন্তীর।

ভাগ্য তার নিশীথ শয্যার পরে শুধু লজ্জা আর কলঙ্কের বোঝাই ঢেলে দিয়েছে। ওদের মত সার্থক সে কোনদিনই হ'তে পারবে না। কোনদিন না।

জীবনের আনন্দের হাটে তার কোন অংশ নেই। কেউ তাকে ডাকবে না। কেউ সহানুভূতি জানাবে না।

এমনি করেই তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে হবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

হঠাৎ চমকে ওঠে জয়ন্তী।

একি! স্বপ্নলোকের ঐ কামনামত্ত পুরুষটি কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক নতুন রূপ ধরে।

মুখে তার ক্ষমাসুন্দর হাসি। চোখে নীরব আমন্ত্রণের ইঙ্গিত।

ত্রস্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয় জয়ন্তী।

গলা শুকনো। দেহ আড়ষ্ট। চোখে জ্বালা। এক অগ্রসর পুরুষের হাতের স্পর্শ কল্পনা করে থর থর করে সে কাঁপতে থাকে ঝরা পাতার মতো।

আশ্চর্য, সে নির্বিকার। কোন খেয়াল নেই। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ক্রমশই যেন সে তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে একটু একটু করে। আরো কাছে। গায়ে গা ঘেঁসে।

দিব্ব কান্তি পুরুষ। পেশীবহুল স্বাস্থ্য ও প্রাণ প্রাচুর্যে যেন উপচে পড়েছে তার জীবন পাত্র। বিধাতা যেন তার সৃষ্টির অপূর্ব সুষমা ওর মধ্যে অজস্র ধারায় ঢেলে দিয়েছে।

ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে ওঠে জয়ন্তী।

কেন তুমি এখানে এসেছ! কি চাই তোমার!

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সহসা শোনা গেল তার অপার্থিব কণ্ঠস্বর।

তুমি স্বার্থক হতে চেয়েছিলে, তাইতো আমি এসেছি। বলো, চাও না তুমি স্বার্থক হতে?

প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে জয়ন্তী।

না না, যে স্বীকৃতির মধ্যে মধুর লজ্জা নেই, গর্ব নেই, বরং জড়িয়ে আছে একটা অপরিসীম অপরাধ,—যা কেউ কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না, তাকে আশ্রয় করে স্বার্থক হতে চায় না সে।

কিন্তু তোমার স্বামী! সংসার! তাকে তুমি স্বার্থক করতে চাও না! ফলে ফুলে ভরে দিতে চাও না?

জবাব দিতে পারে না জয়ন্তী। অসংখ্য বিক্ষুব্ধ প্রশ্ন মাতামাতি শুরু করে তার মনের আড়ালে।

সংসারে স্বামীর চাইতে প্রিয় তার কেউ নেই। তবু আজ প্রতিটি দাম্পত্য মুহূর্ত তার অশ্রুধারায় ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। এ দুঃখ সে রাখবে কোথায়!

নিজের স্বামীকে যে স্বার্থকতায় ভরে তুলতে পারে না, সবাই

তাকে করুণা করতে পারে কিন্তু সমীহ করে না। সংসারে কোন মূল্যই নেই তার।

একমাত্র সেই পারে আজ স্বামীর জীবনে পৃথিবীর রঙ, গান, গতি ও স্বাভাবিক ছন্দকে ফিরিয়ে আনতে।

হোক মিথ্যে, তবু সান্ত্বনার একটা মধুর প্রলেপ যদি তাকে বুলিয়ে দেওয়া যায় তো কার কি ক্ষতি!

তাই হোক। গড়ে উঠুক যা গড়ে উঠবার। যা ভাঙবার তা চুরমার হয়ে যাক। মিথ্যেই সত্যিই হোক।

যে জীবন তাকে সংসার থেকে আড়াল করে রেখেছে আজ এই স্তব্ধ রাত্রির নির্জনতায় তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক।

সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমান, সমস্ত আঘাত সে বুক পেতে সইবে। তবু স্বামী স্বার্থক হোক। তার সংসার ভরে উঠুক।

সহসা চমকে ওঠে জয়ন্তী।

একি! কখন তার দেহটা ভীরু পাখীর মত আশ্রয় নিয়েছে ওর ঐ দুটি বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে।

ঘৃণায় সর্বাঙ্গ গুলিয়ে ওঠে জয়ন্তীর।

মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। তবু সে নিরুপায় হয়ে নিজেকে সঁপে দেয় ওর ঐ নিষ্ঠুর হিংস্র নিপীড়নের কাছে।

তমস্বিনী রাত্রি। চারদিক মৌন, অকম্পিত। কাছে কিনারে কেউ নেই।

জয়ন্তী অনিশ্চিত, বিহ্বল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। তোলপাড় করছে বুকটা।

কেমন যেন একটা শির শির করা জোরালো অনুভূতি পা থেকে উঠে আসছে শরীর বেয়ে বেয়ে। ভাবনা চিন্তা সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

জয়ন্তী সাড়া দেয় না। বাধাও দেয় না। তবু মদমত্ত পুরুষের অদ্ভুত মাতাল করা উষ্ণতায় স্বাভাবিক কারণেই এক সময়ে তার যৌবন

নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। নেশা লাগে আদিম রক্তে।

রক্ত স্রোতে একি অবোধ্য উন্মাদনা। দেহের অণুতে অণুতে একি তপ্ত অনুভূতি। অভূতপূর্ব একি পুলক শিহরণ।

মনে হয় ওর হাতে সে যেন চিরকালের মত বন্দী হয়ে গেছে। পাকে পাকে জড়ানো এই জটিল গ্রন্থি কোনদিনই বুঝি খোলা যাবে না।

বাইরে সময়ের স্রোত বয়ে চলে। সে স্রোত এখানে স্তব্ধ।

জয়ন্তী তেমনি অসাড়। চোখদুটি তেমনি বোজা। ভয় নয়,— উত্তেজনায় উদ্দামতায়।

মনে হয় দেহের মধ্যে যেন বিরাট একটা ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। একটা অভিমান চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গড়ে উঠেছে একটা মমত্ব বোধ। একটা নতুন চেতনা।

দেখতে দেখতে কিসের যেন একটা স্বপ্ন নেমে আসে জয়ন্তীর আধবোজা চোখের কিনারে, ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় ও নেতিয়ে পড়া নিটোল দেহের ভাঁজে ভাঁজে।

মুখের উপর সঘন নিঃশ্বাসের মদির স্পর্শ। কণ্ঠে, কপোলে, কেশে ক্রীড়ারত অঙ্গুলীর চঞ্চল লীলা। হোক স্বপ্ন, তবু যেন ভালো লাগে।

নতুন আস্বাদ। এক অপরিসীম তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন দুটি দেহমন, তবু তারও মধ্যে এক সময়ে একটা নতুন ছবি ভেসে ওঠে জয়ন্তীর মনের পর্দায়।

আজ আর সে একা নয়। নিঃসঙ্গ নয়।

বান্ধবী অনুপমার মতই তার কোলজুড়ে এসেছে ছোট্ট ফুটফুটে একটি রক্তমাংসের শিশু।

হাত পা নেড়ে নিজের মনেই সে খেলা করছে, আর মাঝে মাঝেই মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে।

আর জয়ন্তী!

শিহরিত পুলকে স্তন বৃন্তটি তার মুখে তুলে দিয়ে দুচোখ ভরে সে ওর ঐ দুষ্টুমি উপভোগ করছে।

ঘুম জড়ানো চেতনায় তার কেমন যেন একটা ঝিমঝিম আবেশ। মাতৃত্বের স্বাদ।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে যায়।

জয়ন্তী আত্মহারা। বারবার দেখেও আশা আর যেন মেটেনা তার।

জীবনে যে অনাস্বাদিত আনন্দ এতকাল বন্দনাতেই পর্যবেসিত ছিল আজ তা রূপে রসে বর্ণে গন্ধে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

খোকন এসেছে। তার লাল টুকটুকে মিষ্টি খোকন।

দুধে আলতা রঙ। ইন্দ্রধনুর মত বাঁকা পটে আঁকা রেখার মত ভ্রূ। পাকা ডালিমের মত দুটি ঠোঁট। এক মাথা কালো চুল স্তবকে স্তবকে নেমে এসেছে সুডৌল মুখটি ঘিরে। চোখ যেন আর ফেরানো যায় না।

সময়ের স্রোত এগিয়ে চলে মন্থর গতিতে।

আনন্দে আবেগে উচ্ছ্বাসে কি যে করবে ভেবেই পায় না জয়ন্তী।

কখনো খোকনের মাথার চুলে হাত বুলোয়। কখনো গাল টিপে দেয়। কখনো বুকের উপর চেপে ধরে। আদর করে। চুমো খায়।

আবার কখনো আদরে আদরে কাঁদিয়ে দিয়ে নিজেই কতো কি কাণ্ড করে শান্ত করে।

এ যেন একটা অদ্ভুত নেশা।

খোকনকে বুকে নিলেই কেমন যেন একটা অদ্ভুত স্পর্শানুভূতিতে সারা দেহ মন তার ঝিমঝিম করে আসে। চোখদুটি বুজে আসে মধুর আবেশে। অনন্ত নির্ভরতায়।

খোকনও ঠিক তাই। পরম নির্ভরতায় মায়ের বুকে মুখ গুঁজে এক হাত সে তুলে দিয়েছে তার গায়ের উপর, অন্য হাতে সজোরে আঁকড়ে ধরে আছে তার গলা। যেন সামান্য হাত আলগা করলেই মা তার পালিয়ে যাবে।

ভাবনা শিহরণ আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় জয়ন্তীর রাত্রির প্রহরগুলো।

সে খোকনের মা। খোকন তার ছেলে। সংসারে এর চাইতে বেশী আর কিছুই চায় না সে।

পরিপূর্ণ উন্মাদনার পর পরিপূর্ণ অবসাদ।

সহসা এক সময়ে স্বপ্ন ভেঙে যায় জয়ন্তীর, তবু সে আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত।

সারা দেহে কেমন যেন একটা মনোরম বেদনার ভার।

এ এক আশ্চর্য মধুর বেদনা।

এ বেদনায় জ্বালা নেই। আছে তন্দ্রার বিহ্বলতা।

ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে অবশেষে এক সময়ে চোখ মেলে তাকায় জয়ন্তী! কিন্তু একি!

কোথায় খোকন! কোথায় কে?

কেউ নেই। কেউ নেই। শুধু পড়ে আছে একটা অবিস্মরণীয় জ্বালা। তাছাড়া, আর কোন কিছুই নেই।

বুকটা হাহাকার করে ওঠে জয়ন্তীর।

বার বার চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে ওঠে মুহূর্তের সেই স্নেহ মধুর ছবিটা।

কোথায় গেল সেই মিষ্টি খোকন। সে নেই।

হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হতে পারে না জয়ন্তী। অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে শুয়ে পড়ে চুপচাপ।

ভাবনাটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

চাই একটি পরিপূর্ণ নিটোল ঘুম। ঘুমের অতলান্তে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে থাক।

কিন্তু কোথায় ঘুম! ঘুম আসে না।

সেই একই চিন্তা ঘূর্ণী হাওয়ার মত মনের গভীরে ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার।

অবশেষে সব ভাবনা তলিয়ে গিয়ে জেগে থাকে একটি মাত্র ছবি।

খোকন হারিয়ে গেছে। খোকন নেই।

কিন্তু নেই বললেই তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণিত হয় না।

স্তনবৃন্তে এখনো যেন তার কচি ঠোঁটের নরম স্পর্শটা লেগে রয়েছে।

যথা সময়ে স্বামী ফিরে এলেন, কিন্তু জয়ন্তী তখন কোথায়! তার অনেক আগেই সে দিব্বি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে স্বামীও তাঁর নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

জয়ন্তী অসুস্থ। আহা, সে ঘুমোক।

কিন্তু সত্যিই কি সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়ন্তী!

মিথ্যে কথা।

সে রাত্রে জয়ন্তীর চোখে একটুও ঘুম ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়।

ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে কত কি আকাশ পাতাল ভাবনার মধ্যে যে সেদিন তার রাত্রির প্রহরগুলো কেটে গিয়েছিল সে কথা একমাত্র তার অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না।

উপরে অনন্ত আকাশ। নিচে সীমাহীন সমুদ্র। সব কিছুই অবারিত। উদার।

উদার আজ মনীষাও।

মনের মধ্যে তার জমাট বেঁধে আছে অনেক কথা। অনেক আবেগ।

আজ সে সমস্ত আবেগ ঢেলে দিতে চায়। উজাড় করে দিয়ে শূন্য হয়ে যেতে চায়।

পরদিন জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েই শাশুড়ি অবাক। একি চেহারা হয়েছে বৌমার!

ফ্যাকাসে পাণ্ডুর মুখ। চোখের নিচে রাত্রি জাগরণের কালিমা। মনে হয় বৌমার দেহের উপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। মুখের সমস্ত রক্ত যে নিঃশেষ হয়ে গেছে কি এক অকথিত বেদনায়।

জয়ন্তী অনিশ্চিত, বিহ্বল! চোখে মুখে তার নিবিড় আতঙ্ক। কাঁপছে থরথর করে। যেন অকস্মাৎ একটা নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাষাণ হয়ে গেছে সে।

কি হয়েছে বৌমা! শাশুড়ীর ব্যাকুল প্রশ্ন।

জয়ন্তী নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। কি যেন বলতে চাইল কিন্তু পারলো না। কথা বলতে গিয়ে দেখলো গলা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়। সামনে দাঁড়ানো মাতৃসমা এই মানুষটির দিকে তাকাবার মত শক্তি পর্যন্ত তার লুপ্ত হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে! শাশুড়ীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে, কোন অসুখ বিসুখ হয়নি তো!

—না না, আমার কিছু হয়নি।

কথাটা বেশ একটু জোরেই বেরিয়ে এল জয়ন্তীর মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে পালিয়ে গেল তার দৃষ্টির আড়ালে।

শাশুড়ীর দু'চোখে পুঞ্জীভূত বিস্ময়। কি ব্যাপার!

মনে হয় বৌমার হিসেব নিকেষের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট অসঙ্গতি ঘটে গেছে। বৌমা যেন আর সেই বৌমা নেই।

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যই বৌমা আজ আর বৌমা নেই।

ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে বিছানায় ভেঙ্গে পড়ে অন্তহীন বেদনায়।

সব যেমন ছিল তেমনি আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই যথারীতি চলবে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু বৌমা আর বৌমা নেই। চৌধুরী বাড়ীর পুত্রবধূর অপমৃত্যু হয়েছে।

দেখতে দেখতে গোটা বাড়ীটাতে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এলো।

কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। যেন জীবনের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাইরে শঙ্কায় শুকনো হয়ে ওঠে প্রতিটি প্রাণীর মুখ। কি হল

বৌমার! কি হল জয়ন্তীর!

ভেতরে স্তব্ধ হয়ে বসে এক অশ্রুমুখী নারী। তার সমস্ত বুকখানা ভেঙে নিঙড়ে বেরিয়ে আসছে অশান্ত অশ্রুধারা।

কেউ জানে না কি দুঃসহ, কি তীব্র এই বেদনা। এ বেদনার কোন সান্ত্বনা নেই। সে চেষ্টা করাও বৃথা।

স্বামীর চোখেও সেই একই বিস্ময়! কি হল!

নিজের হাতে সবাইকে পরিপাটি করে খাওয়ানো জয়ন্তীর চিরদিনের সাধ। গত ক' বছরের মধ্যে এমন একটা দিনের কথাও মনে পড়ে না যেদিন তার এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেছে।

অথচ আজ তার দেখা নেই। পরিবেশন করছেন বামুন মা। বৌমার নাকি শরীর ভালো নেই।

কোথায় বৌমা! জয়ন্তী তখন তার ঘরের রুদ্ধ দরজার আড়ালে।

অফিসে যাওয়ার আগে স্বামী ডেকে ডেকে হয়রান, তবু সেই রুদ্ধ দ্বার এতটুকুও উন্মুক্ত হলো না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরে শুধু একটি শব্দ ভেসে এলো।

"আমাকে বিরক্ত করো না।"

একই জবাব পেল ঝি-চাকর দাস-দাসীর দল।

দুপুর উৎরে গেছে। বৌমা না খেলে তারা খায় কি করে! ঐ একটি কথাই তখন ভেসে এলো।

"আমাকে বিরক্ত করো না, তোমরা খেয়ে নাও।"

সর্বশেষে এলেন শাশুড়ী। সেই একই জবাব।

"আমার শরীর ভালো নেই মা, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।"

রাশি রাশি চিন্তার বোঝা নিয়ে শাশুড়ী ফিরে গেলেন। মনে তাঁর অসংখ্য প্রশ্ন।

কি হয়েছে বৌমার! সেই নীরব নম্র হাসিখুশি মেয়েটি যেন আজ একেবারেই বদলে গেছে। কেন এমন হল।

ব্যাপারটা এত আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত যে কারোরই নজর এড়ালো না।

সবাই চিন্তিত। সবাই উদ্বিগ্ন।

শুধু মিঠুয়ারই কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মিঠুয়া দিল্লী চলে গেছে। অবশ্য দিন কয়েক বাদেই তার যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ছিল, তবে হঠাৎ নাকি তার মতের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আজ সকালের গাড়ীতেই সে চলে গেছে।

দিল্লী থেকে সোজা বিলেত। হঠাৎ নাকি কি একটা সুযোগ সে পেয়ে গেছে।

আশ্চর্য, যাওয়ার আগে এ বাড়ীর কারো সঙ্গেই দেখা করে যায়নি। এমন কি বৌদির সঙ্গেও না।

বেশ বোঝা যায় যে স্নেহময়ী বৌদির এই দুঃসহ বেদনা ভেতরে ভেতরে তার মানসিক অবস্থাকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে —যার জন্য ইচ্ছে করেই সে তার মুখোমুখি হতে চায়নি।

সকাল গড়িয়ে দুপুর—তারপর আসে বিকেল।

ছ'টা নাগাদ স্বামী অফিস থেকে ফিরে আসেন। ঘরে পা দিয়েই তিনি অবাক।

আশ্চর্য, জয়ন্তী তার বিছানাপত্র নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে। এ ঘরে শুধু তার একা থাকার ব্যবস্থা।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তাকিয়ে রইলেন শূন্য ঘরটার দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে।

আশ্চর্য, সে দৃষ্টিতে কোন রাগ নেই; ঘৃণা নেই, বিতৃষ্ণা বা অভিমানও নেই।

আছে শুধু অপরিসীম ভালোবাসা। শুধু বেদনার অভিব্যক্তি। আর একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

তার সারা মনকে মন্ত্রমুখর করে রেখেছে জয়ন্তী। জয়ন্তীকে

হারানো তার জীবনে একটা কঠিন দুর্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়!

তবু কেন জয়ন্তী আজ এমন করে দূরে সরে গেল।

সে তো কোনদিন তাকে এতটুকু অবহেলা করেনি। অনাদর করেনি। দুঃখও দেয়নি।

তবে! তবে কেন জয়ন্তী আজ এমন করে হারিয়ে গেল!

দরজার ফাঁক দিয়ে স্বামীর ঐ ব্যথাভরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে বুকটা যেন ফেটে যায় জয়ন্তীর। তবু আজ সে বড় নিরুপায়।

যে আশ্রয়, যে নির্ভরকে অবলম্বন করে সে তার জীবনের এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছিল, আজ তা চিরদিনের মতই মিথ্যে হয়ে গেছে।

চৌধুরী বাড়ীর পুত্রবধূর অপমৃত্যু ঘটেছে। যবনিকার অন্তরালে আজ সে বিগত, বিস্মৃত, মৃত। একমাত্র গ্লানি ছাড়া জীবনে আর কোন পুঁজিই নেই তার।

পৃথিবীটা ক্রমশই যেন নৈঃশব্দের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে চাঁদটাও। মেঘের সঙ্গে তার লুকোচুরি খেলা চলছে বারবার।

মনীষার সারা মুখে আলোছায়ার আলপনা। চোখে সেই সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মনীষার মুখের দিকে। যত শুনছি ততই যেন অবাক হচ্ছি। যত দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি।

কে এই মনীষা! জয়ন্তী-ই বা কে! যেই হোক না কেন, অতি শান্ত নম্র মেয়েটি এত জোর, এত সাহস পেল কোথা থেকে!

এ যেন মস্তবড় একটা বিস্ময়। যাক্ আপাতত মনীষার কথাই শোনা যাক।

দেখতে দেখতে গোটা বাড়ীটাতে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা নেমে এল।

যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই বিশৃঙ্খলা। কোথাও যেন নিয়মানুবর্তিতা বলে কিছু নেই।

আশ্চর্য, জয়ন্তী নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। সেই যে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে তারপর আর কোনদিনই তাকে বড় একটা বাইরে আসতে দেখা যায়নি।

রুদ্ধদ্বারকক্ষে একা থেকে থেকে পৃথিবীর রূপটাই যেন সে ভুলে গেছে। সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়েও দেখে না।

যেন এ সংসারের সে কেউ নয়। অবাঞ্ছিত একজন অতিথিমাত্র।

আজকাল বামুন-মাই তার ঘরে এসে খাবারটা দিয়ে যান। কোনদিন ইচ্ছে হয়তো খায়। তবে বেশীরভাগ দিন পড়েই থাকে।

স্বভাবের দিক থেকেও আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজকাল প্রায় সর্বক্ষণই সে নিজের মনে গুম হয়ে বসে থাকে।

মেজাজটাও খিট্‌খিটে হয়েছে। কেউ ডাকলেও তেমন সাড়া দেয় না। বাড়াবাড়ি করলে ক্ষেপে ওঠে। চেঁচামেচি করে।

মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভাঙনও বেশ দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে।

ফ্যাকাসে মুখে রক্তহীনতার শ্বেতচিহ্ন। চোখের তলায় অনেক নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তি। ঘোলাটে দৃষ্টি। মাথার চুল আলুথালু।

সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা অমানুষিক ভাব। চেনাই যায় না।

সবচেয়ে তার বেশী আক্রোশ বোধ হয় নিজের দেহটার উপর।

মাঝে মাঝেই নিজের দেহের পানে তাকিয়ে কেমন যেন সে ক্ষেপে ওঠে।

হিংসায় জ্বলে ওঠে চোখদুটো। সারামুখে ফুটে ওঠে একটা বীভৎস পৈশাচিক ভাব। যেন দুরন্ত আক্রোশে সে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় নিজের দেহটাকে।

তবু দিনের বেলাটা কোনরকমে কেটে যায় কিন্তু বিপদ হয় রাত্রে। রাত্রি যত বাড়তে থাকে ততই যেন রাশি রাশি আতঙ্ক এসে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তাকে।

মনে হয় অন্ধকার এক শূন্য গহ্বরে সে যেন ক্রমেই নেমে চলেছে পাক খেয়ে খেয়ে।

একটা অতিকায় জানোয়ার যেন ঐ অন্ধকারের অতল থেকে ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে উদ্যত, হিংস্র থাবা মেলে। কিছুতেই যেন তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

ভয়ে আতঙ্কে তখন দুহাতে মুখ ঢাকে জয়ন্তী। দারুণ ভয়।

সবকিছুতেই ভয়। এমন কি দেয়ালে নিজের ছায়া দেখে পর্যন্ত ভয়। মনে হয় সর্বগ্রাসী একটা আগুন যেন দেহটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে তার লেলিহান শিখা দিয়ে।

আতঙ্কে সে তখন পালাতে চায়। কিন্তু কোথায় পালাবে! কোথায় লুকোবে! কোথায় আড়াল! কোথায় শান্তি। সর্বত্রই যে ভয়। এমন কি ঘুমোতে পর্যন্ত ভয়।

এক এক সময় ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে তবু ঘুম আসে না। মনের মধ্যে যত সব আবোল তাবোল চিন্তা। সেই সঙ্গে অজানা আশঙ্কা।

মনে হয় জীবনের একটা ভয়ঙ্কর রূপ যেন ক্রমশই তার দিকে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে আসছে। যার প্রচণ্ড উত্তাপটা যেন এখন থেকেই তার দেহটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে শুরু করেছে।

ভয় ও আতঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ রাত্রির দিকে হয়তো সত্যসত্যই চোখ দুটো বুজে আসে।

তবু শান্তি নেই। মনে হয় দুখানি কালো রঙের অদৃশ্য হাত যেন ঘুমের মধ্যে তার গলা টিপে মারবার জন্য এগিয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দারুণ আতঙ্কে।

স্বামী পাশের ঘরেই থাকেন। কতদিন তিনি কান্না শুনে ছুটে গিয়ে উদ্বেগে ভেঙে পড়েছেন।

"কি হয়েছে জয়ন্তী! ঘুমের মধ্যে তুমি কাঁদছিলে কেন?"

আশ্চর্য! শান্ত হওয়া দূরের কথা বরং স্বামীকে দেখেই সম্বিত ফিরে পেয়ে জয়ন্তী ফুঁসে উঠেছে।

"কে! কে এখানে আসতে বলেছে তোমাকে। আমার কাউকে দরকার নেই। কাউকে আসতে হবে না এখানে।"

স্বামীর সত্যিই তুলনা হয় না। অদ্ভুত তাঁর ধৈর্য। অন্তহীন তাঁর সংযম।

কোনদিন এতটুকু প্রতিবাদ করেননি তিনি। শুধু চোখের তারায় ফুটে উঠেছে অব্যক্ত বেদনার একরকম ছায়া।

কোন অভিযোগ নেই। কোন অভিমান নেই। শুধু বেদনার অভিব্যক্তি।

স্বামী ফিরে যাওয়ার পরে নিজের আচরণের কথা ভেবে আবার নিজেই একসময়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

একি করলো সে! স্বামী যে তার কত মহৎ। কত উদার। এতবড় রূঢ় কথা তাকে সে বললো কি করে।

সত্যিই এমন স্বামী সচরাচর কারো ভাগ্যে মেলে না। এতবড় রূঢ় আঘাতের পরেও আবার তিনি এসেছেন। বারবার এসেছেন। রাতের পর রাত এসেছেন।

কিন্তু কোনরকম জোর করেননি। এতটুকু দাবিও খাটাতে চাননি। শুধু স্ত্রীর দিকে নিঃশব্দ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার নিঃশব্দেই তিনি ফিরে গেছেন নিজের ঘরে।

জয়ন্তী সব জেনেছে। সব বুঝেছে। তবু সে এতটুকুও সাড়া দেয়নি।

কি করে দেবে! সব থাকতেও এক নিষ্ঠুর অভিশাপে আজ সে

সর্বহারা।

একদিন ঐ মুখখানির ব্যথা বেদনা মুছে দেওয়ার জন্য সে সব কিছুই দিতে প্রস্তুত ছিল। দিয়েছেও।

সে কথা কাউকে বলা যায় না। কেউ জানে না তার হৃদয়ের সেই রক্তাক্ত কাহিনী। সে কাহিনী তার একার।

আজ সে নিঃস্ব। হৃতসর্বস্ব। স্বামীকে দেওয়ার মত আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তার।

মানুষ ভাবে এক হয় আর। নইলে জীবন যে তার সঙ্গে এমন একটা নিষ্ঠুর পরিহাস করবে তা জয়ন্তীই কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল!

কিসের অভাব ছিল তার! কি সে পায়নি!

পেয়েছে উপযুক্ত স্বামী। পেয়েছে স্নেহময়ী শাশুড়ী। শাশুড়ী তো নয়,—ঠিক যেন মা। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যেন।

বৌমার অবস্থা দেখে শাশুড়ীর বুঝি ভেতরে ভেতরে দুঃশ্চিন্তার আর সীমা পরিসীমা ছিল না।

কি ভেবে একদিন তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন—এক কাজ কর খোকা—বৌমার শরীরটা ভালো নেই। তুই বরং এবছর ওকে নিয়ে আর একবার পুরী থেকে ঘুরে আয়। বৌমা সমুদ্র ভালোবাসে। ওখানে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা স্বামীর বেশ মনঃপূত হল। জয়ন্তীকে অদেয় তার কিছুই নেই। শুধু পুরী কেন, দরকার হলে জয়ন্তীর জন্য পৃথিবীর আর এক প্রান্তে চলে যেতেও সে কুণ্ঠিত নয়।

কিন্তু সব বৃথা। বেঁকে বসল জয়ন্তী নিজেই।

ভয় সমুদ্রকে নয়! সমুদ্র এখনো তার মনকে টানে।

ভয় স্বামীকে। ভয় স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যকে!

স্বামীর সান্নিধ্যকে আজ সে সত্যসত্যই ভয় পায়। দারুণ ভয়।

স্বামীর পাশে নিজেকে ভাবতে গেলে নিজের উপরই কেমন যেন একটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় মনটা বিষিয়ে উঠে তার।

এত করেও স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যকে এড়ানো গেল না। ফলে কদিন বাদেই একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল।

স্বামীর সেদিনের সেই রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখের ব্যথা-কাতর চাহনি আজো ভুলতে পারেনি জয়ন্তী। সমস্ত কাজের অবকাশে রাত্রিদিন তার চোখের সামনে এখনো ভেসে ওঠে তার সেই কাতর মুখখানি।

অনেক দিন বাদে সেদিন কেন জানি বড় ভাল ঘুম হয়েছিল জয়ন্তীর।

ঘুমের মধ্যে বার বার মনে হয়েছিল কে যেন তার অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলগুলির মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে একান্ত প্রিয়জনের মত। কখনো বা বিস্তৃত কপোলে নেমে আসা অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিচ্ছে পরম যত্ন ভরে।

ঘুম ভেঙে যায় তবু কি এক মধুর আবেশে চোখ বুজে পড়ে থাকে জয়ন্তী। নিমীলিত ক্লান্ত চোখ দুটির তলায় শিথিল ধারায় বয়ে চলে স্বপ্নের পর স্বপ্ন। অজস্র স্বপ্ন!

এ কার স্নেহস্পর্শ! এ যেন অতীতে দেখা এক মধুর স্বপ্ন। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত জ্বালা যেন এই স্নেহস্পর্শে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়েই জয়ন্তী অবাক। শিয়রে বসে আছেন স্বামী। সারামুখে তাঁর মায়াময় স্নিগ্ধতা।

নিমেষে দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল জয়ন্তীর। উন্মত্তের মত দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে ছিটকে নেমে গেল বিছানা ছেড়ে।

সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা। রুক্ষ কঠিন মুখ। ক্ষিপ্ত বন্য চেহারা। চোখ দুটো লাল। মনে হয় বিকারের ঘোরে এই মুহূর্তে একটা সাংঘাতিক কিছু করতেও বোধ হয় সে ইতস্ততঃ করবে না।

স্বামীর দুচোখে উদ্বেগের ছায়া। আস্তে আস্তে তিনি এগিয়ে

গেলেন জয়ন্তীর দিকে।

—কি হয়েছে জয়ন্তী?

জয়ন্তী তখন বেপরোয়া। ছিটকে দূরে সরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে চেঁচিয়ে ওঠে উন্মত্তের মত!

—কে! কে এখানে আসতে বলেছে। শিগ্‌গির বেরিয়ে যাও বলছি।

সারা মুখে অদ্ভুত মমতা ছড়িয়ে আবার কাছে এগিয়ে গেলেন স্বামী।

—কেন, আমাকে কি আসতে নেই! কি হয়েছে জয়ন্তী। আমাকে সব খুলে বল।

—না না! উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে জয়ন্তী, সরে যাও তুমি আমার কাছ থেকে। আমাকে ছোঁবে না বলছি। কক্ষণো ছোঁবে না।

—কেন কি হয়েছে তোমার! স্বামীর সারামুখে বিষাদের কালিমা, তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হয় জয়ন্তী। কেন তুমি এমন হয়ে গেলে! আমি তো কোনদিন তোমাকে এতটুকু অনাদর করিনি। তবু কেন তুমি এমন করে দূরে সরে গেলে।

—না না! আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে জয়ন্তী, তুমি এসো না আমার কাছে। আমাকে ছোঁবে না বলছি। তাহলে আমি চীৎকার করবো। চীৎকার করে এক্ষুণি সবাইকে ডাকবো।

—অমন করো না জয়ন্তী। একবার আমার মুখের দিকে তাকাও। বলো, তোমার কি হয়েছে।

একটা ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত।

এক পা এক পা করে স্বামী এগুচ্ছেন, আর এক পা এক পা করে পিছু হটছে জয়ন্তী।

তাড়া খাওয়া পশুর মত পিছু হঠতে হঠতে শেষ পর্যন্ত জয়ন্তী যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে আর পিছিয়ে যাওয়ার পথ নেই। পিছনেই তার শক্ত দেওয়াল।

জয়ন্তীর রক্তে তখন আগুন ধরে গেছে।

আত্মরক্ষার তাগিদে তবু সে চেঁচিয়ে উঠল শেষ বারের মতো।

—না না! তুমি ঘরে যাও। কক্ষণো ছোঁবে না আমাকে। কক্ষণো না।

—অবুঝ হয়নো না জয়ন্তী। বলো কি হয়েছে তোমার।

কথাটা বলেই স্বামী হাত বাড়িয়ে দিলেন অসীম ব্যাকুলতায়।

জয়ন্তী তখন মরিয়া, বেপরোয়া। উপায়ান্তর না দেখে সঙ্গে সঙ্গেই সে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিল স্বামীর গালে।

স্বামী অসাড়, নিস্পন্দ। ঠিক যেন একটা বজ্রাহত বনস্পতি।

আশ্চর্য, তবু সে মুখে এতটুকু অভিযোগ নেই। শুধু আছে অব্যক্ত বেদনার এক করুণছায়া।

আর জয়ন্তী! উত্তেজনায় তখন কাঁপছে থর থর করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে বোবা দৃষ্টি।

কি যেন হারিয়ে গেল। কি যেন একটা ভুল হয়ে গেল।

মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল কি এক দুঃসহ বেদনার ভারে।

তবে বেশীক্ষণ নয়। সবার সমবেত চেষ্টার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়ন্তীর জ্ঞান ফিরে এলো।

তবে সবাই দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেল ডাক্তারের ছোট্ট একটি কথায়।

সি হ্যাজ কনসিভ্ড্। আপনার নাতি হবে চৌধুরী মশাই। এবার মিষ্টির ব্যবস্থা করুন।

চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই নির্জন বালুকা বেলায় বসে আমি আর মনীষা।

নীচে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র। অট্টহাসির মহানাদে সে ফেটে পড়েছে ফেনায় ফেনায়।

আকাশের বুক থেকে হঠাৎ একটা তারা খসে পড়ে। পড়তে পড়তে অনেক দূর নীচে নেমে এসে কোথায় কোন্ শূন্যে সে হারিয়ে গেল কে জানে!

মনীষা তারই দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশব্দে। অন্তরে তার কিভাবে আলোড়ন চলেছে বোঝা শক্ত।

একটু বাদেই আবার শোনা গেল তার কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বর।

খবর শুনে নিমেষেই যেন চৌধুরী বাড়ীর চেহারাটা পালটে গেল।

সবাই খুশি! সবাই মত্ত। সবাই আত্মহারা। এমন একটা আনন্দের কথা বুঝি চৌধুরী বাড়ীতে ইতিপূর্বে আর কোনদিনই শোনা যায়নি!

শাশুড়ীর দুচোখে আনন্দাশ্রু। বৌমার গায়ে পিঠে হাজার বার হাজার ভাবে হাত বুলিয়েও যেন আশা আর মেটে না তার।

এতদিন বাদে বৌমার পেটে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বংশধর এসেছে। এ আনন্দ তিনি রাখবেন কোথায়!

শ্বশুর মশাইয়ের অবস্থাও তাই। খবর শুনেই ত্রস্তে তিনি ছুটে গেলেন ঠাকুর ঘরে।

অন্ধকার কারাগারে দুঃখের অমানিশা ভেদ করে আজ—এতদিন পরে দেখা দিয়েছে আলোর নিশানা।

আর ভয় নেই। সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক উদ্বেগ দূর হয়ে গেছে। অন্তর ভরে উঠেছে এক অপার্থিব আনন্দের স্নিগ্ধ হিল্লোলে।

বৌমা আজ গোটা চৌধুরী বংশকে একটা চরম দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সতীলক্ষ্মী বৌমার সত্যই তুলনা হয় না।

আর স্বামী! স্বামীর তো কথাই নেই।

বহুদিন ধরে মনে পুষে রাখা এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে বৃথাই এতদিন গুমরে মরেছিল। সেই নিভে যাওয়া আলোটা হঠাৎ এভাবে পূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তা কে জানতো!

জয়ন্তী তার সার্থক জীবনসঙ্গিনী। সে তার পৌরুষের মর্যদা রেখেছে। জয়ন্তীর কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

বাইরে উৎসবের বন্যা।

ভেতরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে জয়ন্তী। দুঃখে আর অপমানে। লজ্জা আর ঘৃণায়।

মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে!

এ কৃতিত্ব, এ গৌরব কিছুই তার প্রাপ্য নয়। সব মিথ্যে।

স্বামীর সংসারকে সার্থক করে তুলতে গিয়ে একরাত্রির ঝড়েই তার এতদিনের নিজের হাতে গড়ে তোলা ঘর তাসের ঘরের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মিথ্যে হয়ে গেছে তার প্রেম। মিথ্যে হয়েছে তার সংসারের সুখস্বাদ। মিথ্যে হয়ে গেছে তার জীবনের সব কিছু।

তবু রেহাই নেই জয়ন্তীর। বাড়ী শুদ্ধ সবার মুখে আজ শুধু বৌমা আর বৌমা।

কিন্তু কোথায় বৌমা!

যে বৌমা একদিন সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে মাথা পেতে নিয়ে স্বামীর সার্থক জীবনসঙ্গিনী হ'তে চেয়েছিল আজ সে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

এত আলো, এত হাসি গান,—শুধু বৌমার বুকের মধ্যে যে কান্নার পাখী সর্বক্ষণ ডানা ঝাপটে মরে তার খোঁজ কেউ পায় না। সে দুঃখ তার একার।

যত দিন যায় ততই যেন ভেতরে ভেতরে আরো বেশী হতাশ ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে জয়ন্তী।

রাগে ঘৃণায় বিদ্বেষে নিজের ঘা খাওয়া জীবনের উপর নিজেই তখন সে জ্বলে ওঠে থেকে থেকে।

মনে হয় তিক্ত যন্ত্রণায় এমন অল্প অল্প করে শেষ হয়ে যাবার

চাইতে নিজেকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই যেন অনেক ভালো। অনেক সুখের।

চেষ্টাও করেছে কিন্তু পারেনি। আবার চেষ্টা করেছে। আবার হার মেনেছে।

সব চেয়ে সে বেশী ভয় পায় আগামী সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে।

দেহের মধ্যে ইতিমধ্যেই যেন বিরাট একটা ভাঙাগড়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে।

কি যেন একটা আকার নিচ্ছে একটু একটু করে। সেই নিরাকার অনুভূতিটা যেন ক্রমশঃই তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে অক্টোপাসের মতো।

কিছুতেই তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

অথচ জয়ন্তী আজ পরিত্রাণ চায়। চায় মুক্তি।

অপরিণত মন ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে যাকে সে আলো বলে ভেবেছিল, আসলে তা আলেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে হলেই যেন ঘৃণার উদ্রেক হয়। দেহ মন বিদ্রোহের সুর তোলে।

এমনি একদিনের কথা।

জয়ন্তী তখন মরিয়া, বেপরোয়া।

মুক্তি চাই। এই দুঃসহ, জ্বালাময় মিথ্যে বন্ধন থেকে যে কোন ভাবে, যে কোন মূল্যে তাকে রেহাই পেতে হবে। সমস্ত কালিমা সমস্ত লজ্জা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

বামুন মা পুরানো লোক! তার হয়তো এসব কিছু জানা থাকতে পারে। তাকেই ধরতে হবে।

খবর শুনে শিউরে ওঠেন বামুন মা। সারা মুখ তার বিবর্ণ! রক্তশূন্য।

বৌমার কাছ থেকে যে এমন একটা অলুক্ষুণে কথা শুনতে হবে

তা বোধহয় আশাই করতে পারেনি সে। কোন রকমে খাবারটা এগিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে পালিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে! কি সর্বনেশে কথা। এ যে ভাবাই যায় না।

অনিবার্য ফল ফলতেও দেরী হলো না।

একটু বাদেই সারা মুখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন শাশুড়ী। কণ্ঠে তার শিশুর মত কাতরতা!

—কি কথা বৌমা! আজ তোমাকে নিয়ে আমাদের কত আনন্দ। কত আশা। আর তুমি কিনা তাকে—

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না তিনি। তার আগেই কণ্ঠটা বুজে এল কান্নায়।

কোন জবাব দিতে পারে না জয়ন্তী। কি বলবে! বলার আছেই বা কি!

তবু দিন কাটে। তবু দিনের পরে রাত্রি আসে। আবার রাত্রির অন্ধকার এক সময়ে হারিয়ে যায় আলোর সমারোহে।

কিন্তু জয়ন্তী! তার কাছে সবই সমান। কোন উপায় খুঁজে পায় না সে। শুধু রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

কেঁদেও বুঝি রেহাই নেই। অদৃশ্য লোক থেকে মাঝে মাঝেই কে যেন তর্জনী তুলে শাসায়।

"তুমি মিথ্যেবাদী! তুমি প্রতারক! তুমি তোমার স্বামীকে ঠকিয়েছো।"

ভয়ে চমকে ওঠে জয়ন্তী! না না, এসব কথা সে শুনতে চায় না।

"তুমি মিথ্যেবাদী। বল, কেন তুমি স্বামীকে সেদিন অমন করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে!

কেন তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওনি! মাথা ধরেছিল! মিথ্যে কথা। তুমি মিথ্যেবাদী।"

দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে জয়ন্তী ! সারা মুখ আরক্ত। বিস্ফারিত দুটি চোখ। বুকের মধ্যে অসহনীয় এক যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। বেশ বোঝা যায় যে হঠাৎ একটা স্নায়বিক উত্তেজনা যেন তার সারা দেহের স্তরে স্তরে, সর্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে উঠেছে।

"চুপ করে রইলে কেন ! জবাব দাও। বল সে রাত্রে কে তোমার ঘরে এসেছিল !"

—না না ! একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় কান দুটোকে সজোরে চেপে ধরে জয়ন্তী !

পারছে না—আর কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছে না ঐ অদৃশ্য অনুশাসনকে।

ঐ অনুশাসন যেন দুঃস্বপ্নের মত রাতদিন তাকে তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। এক মুহূর্তও বুঝি রেহাই নেই ওর ঐ অদৃশ্য শাসানির হাত থেকে।

অথচ নিজের কাছে আজ আর এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই। দুঃস্বপ্নের মত এখনো যেন সেই নিষ্ঠুর সর্বনাশা রাত্রির তমশা চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে।

কেউ জানে না তার হৃদয়ের সেই অব্যক্ত কাহিনী। সেই চরম অপমানের ইতিহাস আজো অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

তবু নিজের মনকে ফাঁকি দিতে পারে না জয়ন্তী। ব্যাপ্তিহীন সঙ্কীর্ণ জীবন ক্রমশঃই তাকে আত্মমুখী করে তোলে।

নানাভাবে সে বিচার করে নিজেকে। কিন্তু কোন সদুত্তর পায় না।

বৃথাই তার ভাবনার স্রোত মনের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে মরে। বেরুবার পথ পায় না।

ভাবনা থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝে মাঝেই তখন সে জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় বাইরের অবারিত নীল আকাশের দিকে। ঐ উদার অপার বিস্তৃত নীল আকাশটা যেন অনেকখানি সান্ত্বনা দেয় তাকে।

আকাশের গায়ে কোন কিছুই চিরস্থায়ী ভাবে আঁকা থাকে না। কখনো মেঘ জমে। আবার পরক্ষণেই হয়তো মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে।

আর কেউ না জানলেও ঐ আকাশটা ঠিক তার মনের কথা জানে।

স্বামী তার সর্বস্ব।

অতীতের কটা বছর যে তার কেমন করে, কত দুঃখ, অভাব অভিযোগের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেছে সে কথা তার চাইতে বেশী আর কে জানে!

স্বামী তার উদার প্রেমের প্রাচুর্য দিয়ে তাকে সেই কঠিন, কঠোর প্রাত্যহিক জীবনের অনশন থেকে বাঁচিয়েছে। মর্যাদা দিয়েছে সহধর্মিণীর।

আজ নিজের দুঃখ বেদনা নারীত্বের চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে তার কৃতজ্ঞতার দাম দিয়েছে।

তাহলে আর দুঃখ কিসের!

না, আর কোন দুঃখ নেই জয়ন্তীর। কিসের দুঃখ!

হয়তো সমাজ ধিক্কার দেবে। হয়তো গোটা সংসার তাকে অসতী বলবে।

বলুক। সমস্ত আঘাত, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি, সমস্ত অনুশাসন সে নিঃশব্দে মাথা পেতে নেবে।

তবু স্বামী বাঁচবে। সংসার বাঁচবে। বাঁচবে চৌধুরী বংশ।

ব্যাস, আরে কি চাই! এই তো সে চেয়েছিল চিরদিন।

আজ সংসারে সবার মুখে হাসি ফুটেছে। এইতো তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। সবচেয়ে বড় পাওনা।

রাত কত কে জানে! আকাশে তারা জ্বলছে দপদপ করে। বোধহয় শেষ রাতের তারা।

জোয়ারের জল নেমে গেছে অনেকক্ষণ। রাতের বাতাসে উঠেছে

সমুদ্রের জলস্রোতের ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি। মাঝে মাঝে ঝাউয়ের বনে করুণ কান্না।

মনীষার কথা এখনো থামেনি। একটু দম নিয়ে আবার সে বলতে থাকে জয়ন্তীর জীবনের শেষ অধ্যায়টি।

তারপর শুরু হল ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে রাত্রির তারার পানে তাকিয়ে প্রহর গোনা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

নিজের কথা আর কোনদিনই ভাবেনি জয়ন্তী। ভাবতে চায়ওনি।

কি হবে ভেবে! ভাগ্য তাকে যে পথে ঠেলে দিয়েছে সেই পথেই সে চলতে বাধ্য।

বুক ভরা শূন্যতা, চাপা আর্তনাদ, আর স্তব্ধ হাহাকার নিয়েই তাকে গড়িয়ে চলতে হবে চিরদিন। এই তার ভাগ্যলিপি।

তবু একটা জীবন জিজ্ঞাসা মাঝে মাঝেই মনকে চঞ্চল করে তুলেছে দারুণভাবে।

সতীত্ব কি দেহাশ্রয়ী! দেহটাই কি সব!

নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিয়ে হয়তো বা জয়ন্তী ভুলই করেছিল, কিন্তু সেদিন নিজেকে না পুড়িয়ে চৌধুরী বংশকে রক্ষা করবার আর কোন উপায়ই তো ছিল না।

জেনে শুনে এই যে সে নিজেকে হত্যা করলো, সংসারে তার কি এতটকুও দাম নেই?

অনেক পথ অতিক্রম করে, অনেক প্রতীক্ষার বেদনা নিয়ে অবশেষে তার জীবনের সেই চরম দুর্ভাগ্যের দিনটি এগিয়ে এল।

সবাই উদ্বিগ্ন। সবার চোখে-মুখে ব্যাকুলতা! কখন কি হয় কে জানে!

না, জয়ন্তী আর এতটুকুও উদ্বেগ বাড়ায়নি চৌধুরী পরিবারের।

নির্বিঘ্নেই সে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

শুধু এক পলকের জন্য আপন সন্তানের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল জয়ন্তী।

তারপর আর তাকায়নি। তাকাতে পারেনি। লজ্জায় ঘৃণায় কেমন যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল সে।

সেই চঞ্চল দু'টি চোখ। সেই দুষ্টুমি ভরা হাসি। তেমনি স্বাস্থ্যদীপ্ত চেহারা। কোথাও যেন এতটুকু অমিল নেই।

জীবনের সেই পরমবন্ধু, চরম শত্রুর সম্পূর্ণ অবয়বটি যেন রেখায় রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবার। আচার-বিচারের দিক থেকে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হল না।

পুরো একমাস জয়ন্তীকে থাকতে হ'ল আঁতুড় ঘরে। তারপর একদিন আবার সে নিজের ঘরে ফিরে গেল সার্থক পুত্রবধূর মর্যাদায়।

বধূরূপে সেই ছিল জয়ন্তীর জীবনের শেষ রাত্রি। তারপর আর কেউ কোনদিন তাকে চৌধুরী বাড়ীতে দেখতে পায়নি।

রঙে রঙে রঙবাহার হয়ে উঠেছিল সেদিন গোটা বাড়ীটা। শুধু আলো আর আলো। আলোয় যেন ভেসে গিয়েছিল চারিদিক।

সবাই উৎসবে মত্ত। সবাই মুখর। সবাই আত্মহারা।

শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী—সবার মনেই পূর্ণতার জোয়ার। চৌধুরী বাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকে কেন্দ্র করে সবাই সেদিন মেতে উঠেছিলেন বাঁধভাঙা বন্যার মতো।

রাত এগারোটার পরে ধীরে ধীরে উৎসবমুখর বাড়ীটা নীরব হয়ে পড়ে।

সারাদিন ক্লান্তির পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে একে একে। নিভে যায় আলোর মালা।

শুধু ঘুম নেই জয়ন্তীর চোখে।

একজন তার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করে চিরদিনের মতই দূরে সরে গেছে। লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুশোচনায়, আর কোনদিনই হয়তো সে তার

মুখোমুখি এসে দাড়াবে না।

তারই দেয়া সন্তানকে চৌধুরী বংশে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবার জয়ন্তীর বিদায়ের পালা।

কি লাভ দিনের পর দিন এই মিথ্যের বোঝা টেনে!

যে সম্মান, যে গৌরব তার প্রাপ্য নয়, স্বার্থপরের মত মিথ্যের মুখোশ পরে তাকে জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখতে তার মন সায় দেয় না।

সারা মনে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অবশেষে এক সময় উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী

আর দেরী নয়! এখুনি তাকে চলে যেতে হবে এই মান-অপমানের বোঝা-বওয়া নিষ্ঠুর সংসারের কাছ থেকে।

তবু যেতে পারে না জয়ন্তী। কে যেন পিছু ডাকে বার বার।

কত কথা ভীড় করে আসে মনে। একটার পর একটা।

এই বাড়ীর এই মৃত্তিকা তার কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্মৃতি জড়ানো এই ঘর।

জীবনের মধুগন্ধে ভরা দিনগুলি সেখানে কেটেছে। তাকে ছেড়ে যেতে চাইলেই কি এত সহজে যাওয়া যায়!

কিন্তু না গিয়ে উপায়ই বা কি! জীবনের স্বাদ নিজেই সে ঘুচিয়েছে। তার মাশুল যে তাকে দিতেই হবে।

ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে ওঠে জয়ন্তী। কি ভেবে অনেকদিন পরে এবার সে এগিয়ে গেল স্বামীর ঘরের দিকে।

স্বামী ঘুমে অচেতন। ঠোঁটের কোণে তার মৃদু হাসির প্রলেপ

বেশ বোঝা যায় যে পূর্ণতার ঝলমলানিতে আজ মন তার ভরা তৃপ্ত।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে চোখের জল যেন আর কোনো মতেই বাঁধ মানে না জয়ন্তীর।

একদিন এই মানুষটিকে সে ভালোবেসেছিল। আজো ভালোবাসে। সংসারে এই একটি মাত্র পুরুষ, যে তার সমগ্র মানস লোককে মন্ত্রমুখর করে রেখেছে।

তবু তার নিবিড় সান্নিধ্যকে উপেক্ষা করে আজ তাকে চিরদিনের মত সরে যেতে হবে।

মন যেতে চায় না—তবু যেতে হবে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে।

এ সংসারে আজ সে মূল্যহীন। সহধর্মিণীর কোন দাবিই তার নেই। স্ত্রীর গৌরব নিজের হাতেই সে মুছে ফেলেছে।

আর কেউ না জানলেও নিজেকে সে জানে। দেহ তার অপবিত্র, সর্বাঙ্গ আবিলতায় ভরা।

পুরুষের আজকের দাগ মুছে যায় কিন্তু সে যে মেয়ে!

এই জীর্ণ, পোকা-ধরা দেহটা নিয়ে স্বামীর পাশে সে দাঁড়াবে কি করে?

কতদিন কেটে গেছে। মাঝে মাঝে রক্তমাংসের দেহটা কত ভাবে বিদ্রোহ করেছে।

তবু নিজের এই অশুচি দেহের স্পর্শ থেকে স্বামীকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছে অনমনীয় দৃঢ়তায়।

কতকাল সে স্বামীকে এভাবে ঠেকিয়ে রাখবে! কতদিন সে বঞ্চিত রাখবে নিজের ক্ষুধার আগুন জ্বালা এই দেহটাকে!

স্বামীর উষ্ণ আমন্ত্রণকে উপক্ষো করার মত শক্তি তার কোথায়!

না না! এতবড় পাপ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

তার চেয়ে নিজেই সে দূরে সরে যাবে। চিরদিনের মতই যাবে।

একটা নিঃসীম মুহূর্ত। এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর কোলের ঘুমন্ত ছেলেকে আস্তে আস্তে স্বামীর পাশে শুইয়ে দিল জয়ন্তী।

স্বামীর পদপ্রান্তে একটি অশ্রুসজল প্রণাম রেখে পরক্ষণেই সে মিশে গেল বাইরের নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকারের মধ্যে। আর তাকে দেখা গেল না।

কত মধু মুহূর্ত, কত কান্নাহাসির মালাগাঁথা দিন—সব পেছনে পড়ে রইল! মিশে গেল, মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

জয়ন্তী হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল তার আশা আর বিশ্বাসে গড়া নীড়। ঘুচে গেল বধূ-জীবনের স্বপ্ন।

এমন কি চৌধুরী বাড়ীর ইতিহাস থেকে তার নামটা পর্যন্ত চির-দিনের মত মুছে গেল। তাদের কাছে তার কোন অস্তিত্বই আর রইলো না।

জয়ন্তী নিজেই সেই ব্যবস্থা করে এসেছিল।

স্বামীর শিয়রে সে রেখে এসেছিল ছোট্ট একটি চিঠি। তাতে লেখা ছিল—একদিন গঙ্গার অতল তলে শান্তি খুঁজতে চেয়েছিলাম। সেদিন পারিনি। আজ ঠিক পারবো। তুমি আমাকে বৃথা খুঁজতে চেষ্টা করো না। জোয়ারের টানে আমার দেহটা যে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে!

তারপর কতকাল কেটে গেছে, তবু স্মৃতি কখনো মুছে যায় না।

আজ জয়ন্তী অনেক দূরে—দক্ষিণ ভারতের একটা হাসপাতালে একজন সেবিকা।

অতীতের সঞ্চয় বলতে আজ তার সারা মনের পরতে পরতে গাঁথা হয়ে আছে শুধু পুঞ্জীভূত ব্যথা আর বেদনার ইতিহাস।

জমার ঘরে শূন্য। সেখানে রয়েছে শুধু বঞ্চনা আর অপমান।

তবু কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে উর্ণনাভের জালের মতই সে নিজের চারপাশে সেই ফেলে আশা জীবনের স্মৃতির জাল বুনে চলে সর্বক্ষণ।

মনে পড়ে পূর্ণ জীবনের কথা। মনে পড়ে সেই সলজ্জ বধূ-জীবনের কথা। মনে পড়ে স্বামীর কথা।

কত বর্ষা, কত বসন্ত, কত কান্নাহাসির মালাগাঁথা দিন কেটে গেছে তবু সেই স্মৃতি আজো তেমনি অম্লান। তেমনি অক্ষয়।

সারা বছর নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও বছরের এই

সময়টাতে কিন্তু কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না জয়ন্তী। কি যেন একটা দুর্বার আকর্ষণে এ সময়ে সবকিছু ফেলে সে ছুটে আসে পুরীর এই সমুদ্র সৈকতে।

একদিন এখানেই সে খুঁজে পেয়েছিল তার জীবনের যত ঐশ্বর্য!

সেই প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর রাত্রি। সেই স্বপ্নমাখা সান্নিধ্য।

এখনো যেন এখানকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে তার অংসখ্য স্মৃতির স্পর্শ।

আজ কোথায় বা স্বামী, আর কোথায় বা সে ছিট্‌কে পড়েছে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো।

তবু অসংখ্য স্মৃতিতে ভরপুর এই দিনটাতে কিছুতেই যেন দূরে সরে থাকতে পারে না সে।

এ নিয়ে হাসপাতালে কতবার কত গোলমাল হয়েছে। কত কথা উঠেছে। তবু কেউ পারেনি তার গতিরোধ করতে।

স্বামীর ভালোবাসার সত্যিই তুলনা মেলে না।

রিক্ত, বুভুক্ষু পুরুষ। প্রেমহীন, বন্ধনহীন, একাকী। তবু জয়ন্তীকে দেয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি আজো তিনি ভোলেননি।

তিনিও বছরের এই দিনটাতে চলে আসেন পুরীর এই সমুদ্র সৈকতে। কোনবার তার এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি।

জয়ন্তী আসে শুধু তারই জন্য। তাকে একটু দেখবে বলেই তো সে আজ এমন করে পথে পথে সময়ে অসময়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়।

দু' একবার দেখাও পেয়েছে। তবে সবই দূর থেকে।

কাছে সে যেতে চায় না। সে ইচ্ছাও তার নেই। তার প্রয়োজনও আজ ফুরিয়ে গেছে।

জয়ন্তী আজ তার কাছে বিগত, বিস্মৃত, মৃত। তাই দূর থেকে দেখেই সে ধন্য হ'তে চায়।

তাকে ধরা যায় না—ছোঁয়া যায় না—তবু দূর থেকে দেখার এই

আনন্দটুকু যেন তাকে পথ চলবার শক্তি জোগায়। ভরসা দেয় সান্ত্বনা দেয়।

এর চেয়ে বেশী জয়ন্তী আজ আর কিছুই চায় না।

অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। সমুদ্র শান্ত। বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে কি এক অসীম ব্যথায়।

আধো আলো আধো অন্ধকারে ঘেরা সমুদ্র সৈকতের এখানে ওখানেও যেন থমকে আছে একটা বোবা কান্নার সুর।

মনীষা চুপ। স্থির অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আকাশের ঐ শুকতারাটির দিকে।

সেই সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া আশ্চর্য আর্তমুখ। ঘন পল্লবিত স্বপ্নময় চোখ দুটিতে সেই অসহ্য বেদনার ছায়া।

মনে হয় কিসের যেন একটা বিরাট শূন্যতা ওর মুখখানিকে ঘিরে রয়েছে। আর সেই শূন্যতার মধ্যে ও যেন বড় নিঃসঙ্গ। বড় অসহায়, বড় একা।

একটু বাদেই আবার শোনা গেল মনীষার কণ্ঠস্বর।

অনেক বোঝা টেনে টেনে আজ জয়ন্তী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনে হয়—আর কতদিন! জীবন বিভ্রান্ত। যৌবন বিপর্যস্ত!

আর কতদিন তাকে এই উচ্ছ্বাসহীন জীবনটাকে বয়ে বেড়াতে হবে! এ বোঝা যে আজ তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

তার চাইতে মৃত্যু আসুক। মৃত্যু এসে তার দুঃসহ বোঝাকে লাঘব করে দিক।

এখন তার জন্যই শুধু অপেক্ষা! শেষ বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর অপেক্ষা। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

তবে এ-নিয়ে দুঃখ নেই জয়ন্তীর। কিসের দুঃখ!

সত্যের পথ চিরদিনই দুর্গম ও ক্ষুরধার। সত্যের পথে যারা

চলেছে তাদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। তাহলে আর দুঃখ কিসের!

তবু একটা জীবন জিজ্ঞাসা আজো তাকে চঞ্চল করে তোলে ক্ষণে ক্ষণে।

কে বড়! স্বামী না সতীত্ব!

সতীত্ব কি কেবল দেহাশ্রয়ী! দেহটাই কি সব!

মল্লিকা, আমি এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে পারিনি।

সব দেশেই এমন একটা সময় আসে—যখন পুরাতন ভেঙে যায় —আবার নতুন গড়ে ওঠে।

নতুনের এই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে আজ সারা জগৎ জুড়ে।

সেই নতুন মানুষই হয়তো পারবে মনীষার জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব দিতে।

পুব আকাশে রঙ ধরেছে—ঢেউয়ের মাথায় মাথায় বিস্তৃত সাগর-বেলায় আর এখানে ওখানে সর্বত্র।

উঠে দাঁড়ালাম। সারারাত কেটেছে নির্জন সমুদ্র সৈকতে। এবার ফিরে যাওয়া দরকার।

মনীষাও সঙ্গে সঙ্গে এল। জয়ন্তীর ব্যর্থ জীবনের ইতিকথা আগেই শেষ হয়ে গেছে। এবার সাধারণ দু' একটা মামুলী কথা মাত্র। সামনেই পেলাম একটা সাইকেল রিক্সা। রিক্সাটাকে কাছে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলাম।

মনীষা অবাক। এই তো পা বাড়ালেই হোটেল। তাহলে আবার রিক্সা কেন!

বললাম—আজই ফিরে যাবো কলকাতায়।

এবার এখনো মন্দির দর্শন করা হয়নি। ভাবছি এই ফাঁকে একবার ঘুরে আসবো। এখন গেলে হয়তো তেমন ভীড় হবে না।

—কোন্ পথে যাবেন? অসীম ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল মনীষার

কণ্ঠে,—সী-বীচ্ হয়ে যাবেন কি ?

—তা যেতে পারি।

—আমি সঙ্গে গেলে খুব অসুবিধে হবে কি ?

হঠাৎ কেন জানি মুখ দিয়ে 'তুমি' সম্বোধনটি বেরিয়ে এল। বললাম—অসুবিধে কিসের! বরং তুমি গেলে আমি খুশিই হবো।

ভোরের কাকলী শুরু হয়েছে। রাস্তায় লোকচলাচল শুরু হয়েছে একটি দুটি করে।

রিক্সা এগিয়ে চলল। পাশাপাশি দুজন। আমি আর মনীষা।

আশ্চর্য! যে মনীষা সারারাত ধরে কথা বলেছে, সে এখন একেবারে নিঃশব্দ নিশ্চুপ।

বেশ বোঝা যায় সারা মনে তার ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

ক্রমশ রিক্সা বাঁক নিল সী-বীচ এর দিকে।

হঠাৎ অবাক লাগল মনীষাকে দেখে। নিতান্তই এক সাধারণ মেয়ের মত কখন সে মাথায় ছোট্ট একটা ঘোমটা টেনে দিয়েছে। আর কোনদিনও ওকে এভাবে দেখিনি।

বাঁয়ে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র। ডাইনে অভিজাত শ্রেণীর একটা হোটেল।

লোকজন অধিকাংশই ঘুমে অচেতন। তবে ভৃত্য ও পরিচারকের দল ইতিমধ্যেই কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মনীষা বলল—একটু থামতে বলুন। আমি যাবো আর আসবো। এক মিনিটের বেশী লাগবে না।

রিক্সা থামতেই মনীষা নিচে নেমে গেল।

সতর্ক ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখলো। তারপর মাথায় আরো একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে মনীষা হোটেলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেল। বোঝা গেল, এ হোটেলে সে নতুন নয়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম! কি ব্যাপার! মনীষার ভাবসাব খুবই সন্দেহজনক। এভাবে তার হোটেলে ঢুকবার কি প্রয়োজন!

ম্যানেজার মুকুন্দবাবু ঠিকই বলেছিলেন। পরিচিত জগতে মনীষা যেন একটা খাপছাড়া, ছন্দহারা, প্রহেলিকা। কিছুতেই যেন ওকে ঠিক বোঝা যায় না।

মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এল মনীষা। কোনরকমে রিক্সায় উঠেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শীগ্‌গির চলুন। আর এক মুহূর্তও দেরী নয়।

চোখ ফেরাতে গিয়েও ফেরাতে পারলাম না।

আশ্চর্য! এ যেন সেই মনীষা নয়! একই সঙ্গে তার সারা মুখে ফুটে উঠেছে দুঃখ, বিষাদ, জ্বালা আর কামনা।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বললাম—কি ব্যাপার বলতো। কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় গিয়েছিলাম! বড় দুঃখের এক রক্তরাঙা হাসি ফুটে উঠল মনীষার সারামুখে, গিয়েছিলাম জয়ন্তীর ঘুমন্ত স্বামীকে একবার আড়াল থেকে দেখতে।

কথাটা বলেই এতক্ষণের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে সহসা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল মনীষা! সে কী কান্না! যেন বহুদিনের একটা জমাট অশ্রুপ্রবাহ বাঁধভেঙে আজ মুক্তি পেয়েছে।

মল্লিকা, কান্না মানুষের জীবনে এমন একটা কিছু নতুন নয়! এমন কত কান্নাই তো দেখছি।

তবু মনীষার এ কান্না যেন ঠিক সেই কান্না নয়। এ কান্নার মধ্যে আরো তীব্র কি যেন একটা জমাট ব্যথা পাকে পাকে জড়িয়ে আছে—যা শুধু চোখেই জল ঝরায় না, বুকটাকেও বুঝি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

চোখের সামনে মনীষা আর জয়ন্তীকে এক হয়ে মিলে মিশে যেতে দেখেও আমি তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিনি মল্লিকা।

শুধু বুকের মধ্যে গুমরে উঠেছিল একটা মাত্র প্রশ্ন। সংসারে

কোন মেয়ে কি তার স্বামীকে মনীষার চেয়েও বেশী ভালোবেসেছিল ?

মনীষা ভুল করেছিল একথা হয়তো বা সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য স্বামীর প্রতি তার অন্তহীন ভালোবাসা।

স্বামীর জন্য কি সে করেনি! কি সে করতে বাকী রেখেছিল!

এমন কি নিজের নিশ্চিত পরিণতির কথা জেনেও অন্যকে আশ্রয় করে স্বামীর সংসারকে ভরে তুলতে সে এতটুকুও দ্বিধা করেনি।

একদিন স্বামী তাকে চরম দুর্গতি থেকে বাঁচিয়েছিল।

প্রতিদানে নারীত্বের চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে তার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছে। বুকের রক্ত নিঙড়ে প্রেমের দেবতাকে সার্থক করে তুলেছে নিজের নিঃশেষ আত্মবিসর্জনে।

একথা জেনেও কি পৃথিবীর মানুষ তাকে একটু ক্ষমা করবে না!

মনীষার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

তারপর একযুগ কেটে গেছে। তবু তাকে ভুলিনি মল্লিকা।

আকাশের বুকে ফুটে থাকা ঐ তারাগুলোর পানে তাকালে এখনো যেন আমি মনীষাকে দেখতে পাই। চোখ বুজলে এখনো যেন শুনতে পাই তার সেই কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর।

সতীত্ব কি দেহাশ্রয়ী! দেহটাই কি সব!

সেদিন আমি মনীষার এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিনি মল্লিকা। আজো কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি।

মনীষার মত তুমিও একজন নারী।

তুমি তার এই অনন্ত জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ো।

মনীষাকে চিনতে তোমার এতটুকুও কষ্ট হবে না।

বছরের এ সময়টাতে পুরীর নির্জন সমুদ্র সৈকতে গেলে নিশ্চয় তুমি তার দেখা পাবে।

অতৃপ্ত জীবন তৃষ্ণা নিয়ে আজো হয়তো সে তার স্বামীকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

দেখেই তুমি চিনতে পারবে।

প্রথমেই তোমার নজরে পড়বে সবটুকু রঙ মুছে যাওয়া একটি আশ্চর্য আর্তমুখ। তারপর দেখবে কালো দীঘির জলের মত অসহ্য বেদনায় ভরা দুটি চোখ।

পার তো তখন তার এই প্রশ্নটার জবাব তুমি দিয়ো।

অনেক রাত হয়েছে।

ঠাণ্ডা আসছে খুব। তাই না। জানালাটা বরং বন্ধই করে দাও। আকাশের তারাগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যাক। মনীষা ঢাকা পড়ে যাক।
